হইল। পাপী তাহার পাপ কার্য্যের জন্য ইহলোক ত্যাগের পর যে কঠোর শাস্তি গ্রহণ করিত, বালিকার সে কাহিনী মনে পড়িল—ভয়ে ক্ষুদ্র শরীরখানি কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিল, আজ জল খাইলে যদি পাপই না হইবে, তবে তাহার স্নেহময়ী জননী এতক্ষণ কেনই বা খাইতে দেন নাই? এবং এখনই বা খাইতে অনুরোধ করিতেছেন না কেন? অতএব ইহা নিতান্তই পাপের কার্য্য। তাই লতিকা পিতার শত আগ্রহ ও অনুরোধ উপেক্ষা করিল, জল স্পর্শ করিল না। হিন্দুর পবিত্র অন্তঃপুর ভিন্ন এ দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় না; বালিকা মৃত্যুপণ করিল—তথাপি জল গ্রহণ করিল না।

২

ক্রমে দিবা অবসান হইল, সমস্ত দিবসের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া সূর্য্যদেব রক্তিম মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক পশ্চিম গগনে অস্তমিত হইলেন। ঘরে ঘরে সান্ধ্যদীপ জ্বলিল, দেব মন্দিরে শঙ্খ-ঘন্টা বাজিয়া উঠিল, ধূপধুনা গুগ্‌গুলের পবিত্র গন্ধ সান্ধ্য-সমীরে মুক্ত আকাশে ছড়াইতে লাগিল। নীল নভোমণ্ডলে দু একটী করিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল, নিশামণি কৌমুদী ধারায় জলস্থল প্লাবিত করিয়া, মধুর হাসিতে বিশ্ববিমোহিত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতি দিবসের সে রুদ্র মূর্ত্তি পরিহার পূর্ব্বক এখন সর্ব্বসন্তাপ হারিণী শান্তিময়ী মূর্ত্তিতে ধরায় বিরাজ করিতে লাগিলেন।

দিবা অবসানের সহিত যেমন প্রস্ফুটিতা প্রফুল্ল নলিনী ধীরে ধীরে মুদিয়া আইসে, লতিকার ও নয়ন তদ্রূপ মাতৃ অঙ্কে ধীরে ধীরে অনন্ত নিদ্রার জন্য মুদিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে রজনী গভীরা হইল; গৃহিনী একবারও চক্ষু মুদ্রিত না করিয়া, অবসন্ন কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া রহিলেন। আর রামময়বাবু, আজ হৃদয়ে যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহার যন্ত্রণায় সমস্ত রাত্রি অনিদ্র থাকিয়া, কর্ত্তব্য নির্ণয়ে ব্যস্ত রহিলেন। তিনি ভাবিলেন, না, পিতা হইয়া আর এ কষ্ট দেখা যায় না, আমি লতির আবার বিবাহ দিব। রাসবিহারী যদি পুত্র কন্যা পৌত্র প্রোপৌত্র জামাতা দৌহিত্র সত্ত্বেও যাট বৎসর বয়সে চতুর্থ পক্ষে বিবাহ করিতে পারে, হিন্দু সমাজ যদি রাসবিহারীকে বিবাহ করিতে সম্মতি দিতে পারে, তাহা হইলে আমার সংসার-অনভিজ্ঞা অষ্টম বর্ষীয়া দুগ্ধপোষ্যা শিশুর পুনঃ বিবাহে কেন সম্মতি দিবে না? আর বিধবা বিবাহ যে ধর্ম্ম বহির্ভূত নয়, তাহারও প্রমাণ আছে।

যখন দেখা যাইতেছে, ত্রিকালদর্শী আর্য্য-ঋষি প্রণীত ধর্ম্ম পুস্তকে বিধবা বিবাহের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন ইহা যে কখনও অশাস্ত্রীয় নয়, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। তদ্ভিন্ন একালের বিদ্যাসাগরের ন্যায় ধর্ম্ম-প্রবণ মনস্বী সাধু প্রকৃতির মহা-পণ্ডিত কখনও বালিকা বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী হইতেন না। তবে আমাদের হিন্দুসমাজ নানা আপত্তি তুলিবে। রামময় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু তাঁহার সেই চিন্তার সাগর আলোড়িত করিয়া রজনীর সেই নৈশ নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া তাঁহাদের পাড়ার নিমাই পাগল ইমন্ কল্যাণ সুরে গাহিতেছিল,—

"শুনভ্রান্ত মন!
ছাড় বিষয় বাসনা সংসার স্বপন।
সংসারে সুখের আশা, জান নাকি মৃগ তৃষা
প্রাণের পিপাসা হেথা মিটেনা কখন!
ধরিয়া নিবৃত্তি অসি, নাশরে প্রবৃত্তি দাসী;
কাম ক্রোধ লোভ মোহ হবে অন্তর্দ্ধান!
সংসারে ভঙ্গুর সবি, কি সুখে এখানে রবি,
স্ত্রীপুত্র আত্মীয় সব ছায়ার মতন!
হরি পদ করি ধ্যান, অন্তরে মন দিবা জ্ঞান,
পাবে সে বাঞ্ছিত ধন চির শান্তি নিকেতন।"

রামময় রুদ্ধ নিশ্বাসে মুগ্ধ চিত্তে সে সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তিনি এতদুর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বিহ্বল চিত্তে সে সঙ্গীতসুধা পান করিতেছিলেন, যে, গান অনেকক্ষণ গীত হইয়া তাহার শেষ মূর্চ্ছনা টুকু কখন নৈশ বাতাসে মিশাইয়া গিয়াছে তাহা জানিতে পারেন নাই। তখনও তাঁহার কর্ণে সুর, তাল, লয়ের সহিত বাজিতেছে—

"সংসারে সুখের আশা, জাননা কি মৃগ তৃষা,
প্রাণের পিপাসা হেথা মিটে না কখন!"

অনেকক্ষণ পর তাঁহার মোহ অপসারিত হইল, তিনি মনে মনে কহিলেন, "নিমাইচাঁদ যথার্থই গাহিয়াছে—

'সংসারে ভঙ্গুর সবি,
কি সুখে এখানে রবি,
স্ত্রী পুত্র আত্মীয় সব ছায়ার মতন!'

কিন্তু আমরা সেই ভঙ্গুর সংসারের মায়া কাটাইতে পারিলাম কৈ? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ষড় রিপুর দাস হইয়া সত্ত্বঃ, রজঃ, তমঃ, ত্রিগুণাতীত হিরণ্যগর্ভাখ্য পরব্রহ্ম বিরাট পুরুষকে হৃদয়ে ধরিতে পারিলাম কৈ? নিবৃত্তি অসির সাহায্যে প্রবৃত্তি দাসীকে জয় করিবার আমাদের ক্ষমতা কৈ? ক্ষমতা নাই বলিয়াই আজ আমরা ষড়রিপুর আজ্ঞার বশীভূত হইয়া সংসার অরণ্যে কেবল ঘুরিয়া কাঁদিয়া মরিতেছি।"

অদূরে কন্যার ম্লান মুখচ্ছবি রামময়ের নয়নে পতিত হইল। এতক্ষণ নিমাই চাঁদের সঙ্গীত শ্রবণে হৃদয়ে যেটুকু শান্তি অনুভব করিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে শত বৃশ্চিকের দংশন জ্বালা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। অধীর চিত্তে গৃহপ্রকোষ্ঠে পদচারনা করিতে করিতে ভাবিলেন, "এ বিবাহে হিন্দু সমাজ ঘোরতর আপত্তি তুলিবে।" রামময়ের এক-দিকে কন্যা স্নেহ, অন্য দিকে সমাজ। তিনি অতিশয় বিচলিত হইলেন। এই সময় রামময়ের হৃদয়-ভাব বুঝিতে হইলে দাঁড়ী পাল্লার প্রয়োজন। এক পাল্লায় কন্যা স্নেহ, অন্য পাল্লায় সমাজ। রামময়ের হৃদয় রূপ কাঁটা কন্যা স্নেহরূপ পাল্লার দিকে হেলিল, ওজনে কন্যা স্নেহরূপ পাল্লাই গুরু হইল—অতএব কন্যা স্নেহেরই জয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "না হয় সমাজ আমাকে একঘরে করিবে, তা করুক। পিতা হইয়া এ বিয়োগান্ত দুঃখের অভিনয় দেখিতে পারিব না। আমি শান্তির পুনঃ বিবাহ দিব। এবিষয়ে আমি হিমাচলের ন্যায় দৃঢ় অটল।"

৩

কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল, রামময় অনেকটা চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন। রামময়কে সমস্ত রাত্রি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখিয়া নিদ্রাদেবী তাঁহার নিকট আসিতে সাহস করেন নাই, এখন

রামময়কে চিন্তা বিমুক্ত সুস্থচিত্ত দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বসন্তাপহারিনী বিরামদায়ক সুকোমল অঙ্কে তুলিয়া লইলেন।

রামময় এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিলেন—যেন কাষায় বস্ত্র পরিহিত এক দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ পুরুষ, রোষ-কষায়িত লোচনে তাঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক শিয়রে দণ্ডায়মান আছেন। রামময় চিনিলেন এ তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেব। বহুদিবস পরে পিতৃ দেবের দর্শন পাইয়া ভক্তিগদ্গদচিত্তে যেমন চরণ স্পর্শ করিতে যাইবেন, অমনি দুই পদ পশ্চাৎ সরিয়া সেই পুরুষ যেন ক্রোধ-কম্পিত স্বরে কহিলেন 'কুলাঙ্গার! তুই আমার চরণ স্পর্শ করিস না।" রামময় যেন দুঃখিত চিত্তে বিনীত কণ্ঠে কহিলেন, "কেন পিতা! এ অধম সন্তানের প্রতি কুপিত হইয়াছেন? আমি কি অপরাধ করিয়াছি?" সেই পুরুষ তখন জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "কুলাঙ্গার! সমাজদ্রোহী তুই আবার জিজ্ঞাসা করিতেছিস কি করিয়াছি? তুই বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়া আমার পবিত্র বংশে কালী দিতে উদ্যত হইয়াছিস। আমার রক্তে যে এমন কুলাঙ্গার জন্মিবে পূর্ব্বে জানিলে সুতিকাগারে বিনষ্ট করিতাম। আজ তুই সমাজের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিধবা কন্যার বিবাহ দিতে উদ্যত হইয়াছিস, কাল তোর দেখিয়া সমাজের আর একজন দিবে, এইরূপে ক্রমশঃ সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলন হইয়া যাইবে, তখন হিন্দু সমাজের পবিত্র গৌরব লুপ্ত হইবে—হিন্দু বিধবার ব্রহ্মচর্য্য লোপ পাইবে, হিন্দুর যদি হিন্দুয়ানী লোপ পাইল তবে রহিল কি? কুপুত্র! আবার জিজ্ঞাসা করিতেছ কি করিয়াছি?

রামময় কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "পিতঃ! আপনি যে সমাজের কথা বলিতেছেন, সে সমাজ নহে, সে শ্মশান। ঐ দেখুন আমার অষ্টম বর্ষীয়া দুগ্ধের শিশু একবিন্দু জলের জন্য হাহাকার করিতেছে কিন্তু দেশাচার বলিতেছে—উহার মুখে জল দিও না, আজ একাদশী। বলুন পিতা, সন্তানের পিতা হইয়া কি এ যন্ত্রণা সহ্য করা যায়? হিন্দু সমাজের অধঃপতন কখনই আমার বাঞ্ছনীয় নহে, কিন্তু যে স্বামী চিনে না, সংসার জানে না, তেমন দুগ্ধপোষ্য শিশু বালিকার পুনরায় বিবাহ কি দোষের বলুন? পিতা! আমার এ সন্দেহ ভঞ্জন করুন।"

এবার সে পরুষকণ্ঠে কোমলস্বর উচ্চারিত হইল—"বৎস! সামান্য আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়া কাপুরুষের লক্ষণ। চতুরাশ্রমের মধ্যে সংসার আশ্রমই প্রধান। উক্ত আশ্রম-ধর্ম্ম পালন করিয়া রাজর্ষি জনকাদি সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব কর্ম্মকরা সংসারী মাত্রেরই আবশ্যক মনু বলিয়াছেন—

"আরে ভেটৈব কর্ম্মানি শ্রান্তঃশ্রান্তঃ পুনঃপুনঃ
কর্ম্মণ্যার ভমাণং হি পুরুষং শ্রীনিষেবতে॥"

কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এ কথা স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ বলিয়াছেন। যখন সংসারীর কর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তখন কি সামান্য আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়া প্রকৃত সংসারীর কর্ত্তব্য? দেখ ঝড় আরম্ভ হইলে অনেক তরু অল্প আঘাতেই ধরাশায়ী হয়, তাহারা জগতের কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না, কিন্তু যে মহীরুহ সেই ভীমপ্রভঞ্জনের ভীমবল উপেক্ষা করিয়া সবলে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়, কালে তাহার পত্র পুষ্প

ফল বীজ ছায়াদ্বারা জগতের মহান উপকার সাধিত হয়, তদ্রূপ মানব সংসারের বিপদ-রূপ ঝঞ্ঝায় যদি ধৈর্য্যরূপ বলের সাহায্যে অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থ হয়, কালে সে অনেকের আশ্রয়স্থল হইয়া সৎকর্ম্ম-দ্বারা ঈশ্বরের প্রীতি সাধন পূর্ব্বক জগতের অশেষ উপকার সাধনে সক্ষম হয়। অতএব অল্প আঘাতে না ভাঙ্গিয়া বরং আঘাতের জন্ত সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিয়া জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভক্তি, যোগ, দয়া, মায়া, তিতিক্ষা, ধৈর্য্য, সাহস ও বলের সহিত সংসার পালনে প্রবৃত্ত হও। বিধবা-বিবাহ স্তায়সঙ্গত কি না, এ প্রশ্নের উত্তর আমাপেক্ষা আমাদের আর্য্যশাস্ত্রকার মনু ভাল বলিতে পারেন।

তুমি নির্ব্বোধ নহ, যাহা বলিলাম, ইহাই যথেষ্ট বিবেচনা করি, কিন্তু তোমার যদি আরও কিছু শুনিতে বাসনা থাকে, আমার পার্শ্বদেশ অবলোকন কর।"রামময় যেন দেখিলেন, তাঁহার পিতার পার্শ্বদেশে এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবা পুরুষ নতবদনে দণ্ডায়মান। কিন্তু তাহার সেই সৌন্দর্য্যমণ্ডিত ফুল্ল কমলের স্তায় মুখমণ্ডল বিষাদের গভীর রেখায় অঙ্কিত! বিশাল নয়ন যুগলে গাঢ় কালিমা লেপিত। রামময়ের সহিত দৃষ্টি বিনিময় হওয়ায় যুবক করুণকণ্ঠে কহিল, "পিতঃ! এত শীঘ্র যে আপনার স্মৃতির মন্দির হইতে আমাকে বিসর্জ্জন দিবেন তাহা জানিতাম না। আপনার কন্তার পুনরায় পরিণয় দিবার সংকল্প করিয়াছেন। আপনার কন্তার সহিত ইহলোকের সকল সম্বন্ধ শেষ হইলেও পরলোকের সম্বন্ধ শেষ হয় নাই। তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্ত তাহার আশাপথ চাহিয়া আছি, আপনি সে মিলনের—সুখের পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতেছেন কেন? তাহাকে অপরের অঙ্কশায়িনী করিয়া ব্যভি-চারিণী করিতেছেন কেন? তাহার স্বর্গের পথ রোধ করিয়া মহাপাতক সঞ্চয় করিতেছেন।"

রামময় কহিলেন, "বৎস! অন্তায় কথা কহিতেছ। আমার কন্তা দুগ্ধের শিশু, সে সংসার জানে না, তোমাকে চিনে না। তোমার স্মৃতি তাহার হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিতে পারে এরূপ কোন ঘটনাও ঘটে নাই, এমত অবস্থায় তাহার বিবাহ দিলে সে ব্যভিচারিণী হইবে না।"

যুবক কহিল, হিন্দুর গৃহের অষ্টম বর্ষীয়া বালিকা স্বামীর স্মৃতি যথেষ্ট স্মরণ রাখিতে পারে। কিন্তু সে কথা যাক্ আপনার কথাই ধরিলাম, সে বালিকা সংসার-অনভিজ্ঞা কিছুই বুঝে না, জানে না কিন্তু আপনি ত তাহার পিতা—জন্মদাতা—তাহার অভিভাবক, আপনি স্তায়তঃ ধর্ম্মতঃ আমার হস্তে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া তাহাকে সমর্পণ করিয়াছেন। আজ কোন পাপ মন্ত্রনার বলে অনুপ্রাণিত হইয়া, আমার ধর্ম্মপত্নী অপর করে সমর্পণ করিতে সাহসী হইয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা, আপনার পাপ সঙ্কল্প কথনই সফল হইবে না।"

রামময় ইহার কি উত্তর দিতে যাইতে-ছিলেন, হঠাৎ গৃহিণীর করুণ ক্রন্দনে তাঁহার সেই বিস্ময়জনক দীর্ঘ স্বপ্নের অবসান হইল। গৃহিণী অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া বলিতেছেন, "ওগো উঠে দেখ এসে, আমার লতিকা কেমন করিতেছে।" রামময় এক লম্ফে শয্যা ত্যাগ করিয়া কন্তার পার্শ্বে আসিয়া

বসিলেন। হায়! তিনি কি দেখিলেন? প্রভাতের চন্দ্র যেমন ধূসর পাণ্ডুর মলিন নিষ্প্রভ, লতিকার সেই চল চল অতুল শ্রীসম্পন্ন লাবণ্য জ্যোতিঃ ও আজ তদ্রূপ নিষ্প্রভ। বসন্ত বল্লরী যেমন নিদাঘ-আতপে শুখাইয়া পড়ে, আজ লতিকাও তদ্রূপ দারুণ কালের আতপে মাতৃ অঙ্কে ঢলিয়া পড়িয়াছে। রামময় কন্যার অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুপ্লাবিত বক্ষে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ডাকিলেন, "লতিকা মা! সে স্নেহার্দ্র স্বর আসন্ন মৃতপ্রায়া লতিকার কর্ণকুহরে আঘাত করিল। আকর্ণ বিস্ফারিত কৃষ্ণ তারিকাযুক্ত কমল-নয়ন দুটী ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইল। আজ সে বিশাল নেত্র-যুগলে আর সে চঞ্চল সরল কটাক্ষ নাই; তাহা আজ জ্যোতিঃ ও দীপ্তিহীন। লতিকা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল, 'বাবা!'" পর মুহূর্ত্তে মাতৃ অঙ্কে চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইল। পিতা মাতার শত অশ্রু জলে, শত সাধনায়, শত প্রাণ পাতেও আর মুহূর্ত্তের জন্য সে চক্ষু উন্মীলিত হইল না।

তখন প্রভাত রৌদ্রে দিগন্ত উদ্ভাসিত। জীবকুল নিদ্রার শান্তিপ্রদ ক্রোড় হইতে নয়ন উন্মীলিত করিয়া মস্তক উত্থিত করিতেছে, বিহগকুল প্রভাতী কুজনে শ্রবণে পীযুষ বর্ষণ করিতেছে, বালারুণরঞ্জিত হরিৎ বর্ণ তরুলতা প্রস্ফুটিত পুষ্প সম্ভারে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়া প্রভাত বায়ুতে নাচিয়া নাচিয়া সুরভী শ্বাস ঢালিতেছে।

সেই মধুরোজ্জ্বল প্রভাতে পার্শ্বের বাটীতে মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া বাজিয়া রাস বিহারীর চতুর্থ পক্ষের নববধূর অভ্যর্থনা বিঘোষিত করিতেছিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে রামময়ের গৃহে যে মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দনের রোল উঠিল তাহা লেখনী মুখে প্রকাশ করা অসাধ্য।

রামময়ের সংসার নন্দনের প্রফুল্ল পারিজাত কালের ঝঞ্ঝায় ছিন্ন হইয়া কোথায় অদর্শন হইল! যিনি জনক জননীর ক্রোড়ে সন্তান দিয়া আবার কাড়িয়া লন, সেই লীলাময় অন্তর্যামী ভিন্ন তাহা আর কে বলিতে পারে!

শ্রীমতী সরলা সুন্দরী মিত্র।

নিশীথের গান।

(ভাবানুবাদ)

হে কুসুম গন্ধ-বাহী সুমন্দ পবন,
ধীরে ধীরে হও প্রবাহিত।
শান্ত, সমাহিত, নীল সমুদ্র-হৃদয়
মৃদুস্পর্শে করি দোলায়িত।
অস্তগামী হিমাংশুর ম্লান ছায়াখানি,
পড়িয়াছে সাগর-সলিলে,
ধীরে ধীরে চুমি' তারে হও প্রবাহিত
মন্ত্রমুগ্ধ স্তব্ধ নিশাকালে।
মুক্ত বাতায়ন পথে পশি গৃহমাঝে,
আলোকিত হের কক্ষখানি,
সুকোমল শয্যাতলে লভিছে বিরাম
সুখসুপ্ত শিশু ও জননী।
শোন মুগ্ধা নিশীথিনী আপনার মনে
কি করুণ গাহিতেছে গান;
সিন্ধু মৃদু মৃদুতর প্রশান্ত কল্লোলে
সে সঙ্গীতে মিশাইছে তান।
সুদূর পশ্চিম হ'তে আসিছে তরণী,
ভিড়াইয়া আন তারে তটে,
আজ ফিরাইয়া গৃহে প্রবাসী পিতারে
প্রিয়তম শিশুর নিকটে।

শ্রীচারুলতা গুপ্তা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 679. March, 1920.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৭৯ সংখ্যা।	ফাল্গুন, ১৩২৬। মার্চ্চ, ১৯২০।	১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

'এই তো তুমি।'

(গান)

এই তো তুমি সূর্য্য-আলোকে
এই তো তুমি অরুণ আকাশে
এই তো তুমি প্রভাত-পুলকে
এই তো তুমি পুষ্প-বিকাশে!
এই তো তুমি পাখীর কণ্ঠে
গেয়ে ওঠ এমন আনন্দে
ঝর্ণাধারার গভীর ছন্দে
বেজে ওঠ দখিন বাতাসে!

এই তো তুমি আমার হৃদয়ে
চলেছ আজ বিশ্ব-বিজয়ে
এই তো তুমি প্রাণের আনন্দে
বাজাও আমায় এমন ছন্দে।
এই তো তুমি গানে গানে
জেগেছ মোর প্রাণে প্রাণে
বর্ষা-শরৎ কতই বসন্তে
লিখে গেছ হৃদয় আকাশে॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল, বি, এ।

কৃতজ্ঞতা।

মহাভারতের যুদ্ধের প্রারম্ভে যখন শ্রীকৃষ্ণ কর্ণের নিকট গমন করিয়া তাঁহার প্রকৃত জন্মের পরিচয় দিবার পর বলিলেন, "হে কর্ণ, যদি পাণ্ডবদিগের পক্ষে যোগদান কর, তাহা হইলে তুমি সর্ব্বতোভাবে পাণ্ডবদিগের অগ্রজ হইয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়া থাকিবে, এবং যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা অনুজের মত তোমার অনুবর্ত্তী হইয়া থাকিবে।" এতবড় পৃথিবীর অধীশ্বরত্বের সুযোগ মহাত্মা কর্ণ কেবল দুইজনের প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুরোধে স্বীকার করিতে পারিলেন না। প্রথমতঃ তাঁহার পালক পিতা অধিরথের প্রতি,

দ্বিতীয়তঃ তাঁহার আশ্রয়দাতা পরম মিত্র রাজা দুর্য্যোধনের প্রতি। যে অধিরথ তাঁহাকে পরিত্যক্ত ও সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় সাদরে কোলে তুলিয়া লইয়া পুত্রের মত প্রতিপালন করিয়া এত বড় করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহার পুত্রত্বের পবিত্র বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি নূতন করিয়া কুন্তী ও পাণ্ডুরাজের পুত্রত্বের দাবী করিতে স্বীকার করা সমীচীন মনে করিলেন না। এমন কি সেই পালনকর্ত্তার প্রতি তিনি এরূপ কৃতজ্ঞতায় বদ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি নিজে প্রকৃতপক্ষে ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত হইলেও শুধু পালক পিতার সম্মানরক্ষার্থই আপনাকে হীন সূতজাতীয়রূপে পরিচিত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ না করিয়া বরং তাহাতে পরিতৃপ্ত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত ক্ষত্রিয়ত্বের ও দাবী করিতে চাহিলেন না। আর যে দুর্য্যোধন তাঁহাকে আপনার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ রাখিয়া এই মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং তাঁহার হীন সূতত্বের কথা ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে পরম মিত্ররূপে আপনার স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়াছেন, সেই দুর্য্যোধনের পক্ষেই যুদ্ধ করা তাঁহার পরম গৌরবজনক মনে হইল, এবং সে গৌরবের নিকট শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তাবিত পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইল। তাই পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব প্রাপ্তির আশায় তিনি দুর্য্যোধনের পক্ষ ছাড়িয়া পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করিতে সম্মত হইলেন না।

তাহার পর, কুন্তী স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিয়া আপনার জ্যেষ্ঠপুত্ররূপে তাঁহার পরিচয় দান পূর্ব্বক তাঁহাকে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃ রূপে যুধিষ্ঠিরের সহিত মিলিতে পরামর্শ দিলেন, তাঁহার পিতা সূর্য্যও আকাশবাণীদ্বারা তাঁহাকে কুন্তীবাক্যের অনুসরণ করিতে বলিলেন, কিন্তু কর্ণের কৃতজ্ঞ হৃদয় কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, তিনি বলিলেন, "হে জননি, আপনাকে মিথ্যা কহিবার প্রয়োজন কি? ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের নিমিত্ত আমি যাবতীয় বল ও শক্তি বিস্তারপূর্ব্বক আপনার নন্দনগণের সহিত নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব। আমাকে যখন সৎপুরুষ-সমুচিত বিশুদ্ধ চরিত্র রক্ষা করিতেই হইবে, তখন যথার্থ হিতকর হইলেও আপনার উপদেশ কোনমতেই প্রতিপালন করিতে পারি না।"

তাহার পর ঐ যুদ্ধের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির যখন আশীর্ব্বাদ গ্রহণ বাসনায় ভীষ্ম ও দ্রোণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা উভয়েই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, —"আমরা কৌরবদিগের নিকট অর্থের বশতাপন্ন হইয়া ভৃতিভুক্ হইয়াছি, তুমি যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কি বর প্রার্থনা কর প্রকাশ করিয়া বল।" অর্থাৎ আমরা যখন কৌরবের ভৃতিভুক, তখন কৌরবের পক্ষে থাকিয়া তোমাদের সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে, তুমি প্রার্থনা করিলেও আমরা এ পক্ষ কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না, বা এই যুদ্ধ হইতে বিরত হইতে পারিব না। তুমি যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা থাকে ত কর।

ইতিপূর্ব্বে যখন শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষের সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন সে ভীষ্মও দ্রোণ দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার জন্য বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এবং দুর্য্যোধন তাহাদের কথা না শুনায়

তাঁহাকে "পাপাশয়" বলিয়া ভর্ৎসনা করিতেও ছাড়েন নাই, এক্ষণে যুদ্ধ অনিবার্য্য দেখিয়া সেই ভীষ্ম ও দ্রোণ দুর্য্যোধনের ভৃতিভুক্ বলিয়া তৎপ্রতি কৃতজ্ঞতাপ্রকাশার্থ এই যুদ্ধ আপনাদের একান্ত অনভীপ্সিত হইলেও উহাতে এরূপ দৃঢ়তার সহিত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, যে যুধিষ্ঠির যখন তাঁহাদের নিকট আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে গমন করিলেন, তখন বলিলেন "যুদ্ধ ব্যতীত অন্য বর প্রার্থনা কর !"

কৃতজ্ঞতার অনুরোধে কর্ণ যেমন হেলায় পাণ্ডবপতিস্বরূপ মহৎ ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিলেন, কৃতজ্ঞতার অনুরোধে তেমনই পুণ্যাত্মা ভীষ্ম ও দ্রোণ দুর্য্যোধনের অধর্ম্মমূলক যুদ্ধের প্রশ্রয় দিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না,—ইহা অপেক্ষা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন আর কি হইতে পারে ?

জগতে এইরূপ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন বিরল নহে। মহাভারতের যুগের বহুশতাব্দী পরে যখন ভারতভূমি যবনের করতলগত, সেই সময়ে হোসেনসাহ নামক এক যবন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দাসত্ব হইতে অদৃষ্টবশে এক বিপুল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া পূর্ব্বপ্রভু সেই ব্রাহ্মণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তাঁহার নামেই আপনার প্রতিষ্ঠাপিত নূতন রাজ্যের নামকরণ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

এই কৃতজ্ঞতা মানবমাত্রেরই যে একটী বিশেষগুণ, তাহা সহৃদয় পাঠক পাঠিকা-দিগকে নূতন করিয়া বলিবার কোন আবশ্যকতা দেখি না। কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে, তাহা পুস্তক হইতে জানিবারও প্রয়োজন হয় না। উহা প্রাণিমাত্রেরই স্বাভাবিক গুণ। যেমন বনমেঘাচ্ছন্না পৌর্ণমাসী রজনীতে মেঘাবরণ অপসারিত হইবামাত্রই নির্ম্মল জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোক আপনা আপনি চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ যখন ঘনদুঃখভারে কাহারও হৃদয় আচ্ছন্ন থাকে, সেই সময় যদি কেহ দয়া করিয়া ঐ দুঃখের আবরণ কিছু উন্মুক্ত করিয়া দেয়, তখন হৃদয় হইতে আপনা আপনিই সেই দুঃখ মোচনকারীর উপকার-প্রত্যভিজ্ঞাপক একটা পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ভাব উত্থিত হইয়া থাকে, তাহাই হইল কৃতজ্ঞতা। এই কৃতজ্ঞতার আধারভূত হৃদয়সমূহের প্রকৃতিগত ভেদ অনুসারে কৃতজ্ঞতারও ভেদ হইয়া থাকে। আমরা দেখিতে পাই কাহারও হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ, কাহারও হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার পরিমাণ অতি অল্প, কাহারও বা মোটেই কৃতজ্ঞতা নাই। কাহারও কাহারও হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা স্থায়িভাবে থাকে, তাহারা আজীবন উপকারকের উপকার স্মরণ করিয়া প্রত্যুপ-কারে চেষ্টা করিয়া থাকে, কাহারও কাহারও বা হৃদয়ে অস্থায়িভাবে থাকে, তাহারা হয়ত উপকারপ্রাপ্তির সময় অথবা তৎপরে কিছুদিন পর্য্যন্ত উপকার স্মরণ করিয়া রাখে, পরে ভুলিয়া যায়।

সকলেই জানেন, স্বচ্ছ পদার্থের উপরই সূর্য্যকিরণ পড়িলে তাহা প্রতিফলিত হইয়া থাকে, এবং যে পদার্থ যত স্বচ্ছ, তাহাতে ততই সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত হইয়া থাকে, কিন্তু মলিন দ্রব্যের উপর সূর্য্যকিরণ মোটেই প্রতিফলিত হয় না। কৃতজ্ঞতা পক্ষেও সেইরূপ। যে হৃদয় যত স্বচ্ছ অর্থাৎ বিশুদ্ধ

রা সত্ত্বভাবপ্রধান তাহাতে তত পরিমাণে কৃতজ্ঞতা প্রতিফলিত হইয়া থাকে, আর যে হৃদয় যত মলিন অর্থাৎ অবিশুদ্ধ বা তমোময় তাহাতে ততই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায় না।

এক্ষণে আরও স্পষ্ট করিয়া দেখা যাউক, মর্ত্তলোকের এই স্বর্গীয় গুণটীকে লোকে কি কি কারণে হারাইয়া মর্ত্তকে পূতিগন্ধময় নরকের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। সেই কারণগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে প্রথমে স্বার্থ-চিন্তার প্রতি দৃষ্টি পতিত হয়। প্রবল স্বার্থান্ধ হইয়া মানব কেবল নিজের বিষয়ই চিন্তা করিয়া থাকে, জগতে যে নিজের চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা আছে, তাহা তাহার মনে একবার ধারণাও হয় না। সে নিজভাবে উন্মত্ত হইয়া উপকারকের উপকার কথা ত ভুলিয়াই যায়, এতদ্ব্যতীত নিজের নারকীয় স্বার্থ পূর্ণ করিতে উপকারকের অনিষ্ট সাধন করিতেও পশ্চাৎপদ হয় না। সেনাপতি পুষ্পমিত্র যে রাজা বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, আলাউদ্দিন যে খুল্লতাত জেলালুদ্দীনকে বিনাশ করিয়া দিল্লীর সম্রাট্ হইয়াছিলেন, আরঙ্গজীব যে দিল্লীর সম্রাটের তক্তায় বসিবার জন্য স্বীয় জনককে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, সিরাজউদ্দৌলার অন্নপালিত মোহম্মদী বেগ যে অর্থের লালসায় সিরাজের মুণ্ড ছিন্ন করিয়াছিল, ভবানন্দ মজুমদার যে রাজ্যলোভে মানসিংহকে প্রতাপাদিত্য-রাজ্য প্রবেশের গুপ্তপথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন—এ সমস্তই স্বার্থমূলক কৃতঘ্নতার দৃষ্টান্ত।

আরও আমরা দেখিতে পাই, আত্ম প্রভুত্ব-বুদ্ধি অতিরিক্ত মাত্রায় থাকিলেও হৃদয়ে কৃতজ্ঞতার উদ্ভব হয় না। কারণ আত্ম-প্রভুত্ব-বুদ্ধিতে লোকে কাহারও হীন হইতে চাহে না। এখন, একজন অপর একজনের উপকার করিলে বস্তুতঃই উপকৃত ব্যক্তি স্বতঃই উপকারকের নিকট একটু হীন হইয়া থাকে; কারণ সে নিজে যাহা পারে নাই, অপরে তাহা করিয়াছে। কৃতজ্ঞহৃদয় ব্যক্তি কিন্তু সেই হীনতাকেই আপনার গৌরব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রবল প্রভুত্ববুদ্ধি—সম্পন্ন ব্যক্তি নিজের সেটুকু হীনতা স্বীকার করিতে চাহে না। উপকারক যে উপকার করিয়া তাহার প্রভুত্ববুদ্ধির হীনতা সম্পাদন করিল, কেবল এইটুকু মাত্র বুঝিয়া সে উপকারকের উপকার ত স্মরণই রাখে না, বরং অকৃতজ্ঞ ব্যবহার দ্বারা এই স্বকল্পিত হীনতা-বুদ্ধির প্রতিশোধ লইতেও ছাড়ে না। পরলোকগত মহাত্মা ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় এই জাতীয় প্রভুত্ববুদ্ধিসম্পন্ন অকৃতজ্ঞ নরাধমকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেন—"অমুক লোকের ত আমাকে কোনও গালি দিবার কারণ নাই, আমি ত তাহার কোন উপকার করি নাই।"

অনেক সময়ে আবার সঙ্কীর্ণচিত্ত উপকারকের দোষেও উপকৃত ব্যক্তির হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবার অবসর পায় না; উপকারক যদি নিজ প্রভুত্ব-বুদ্ধিতে মনে করে যে অমুকের উপকার করিয়া একেবারে মাথা কিনিয়াছি, এবং তাহা মনে করিয়া অযথা তাহার উপর প্রভুত্ব বুদ্ধি চালনা করিতে যান, তাহা হইলে উপকৃত স্বীয় উপকারের জন্য উপকারকের প্রতি আপনা হইতে যে টুকু

মাথা নত করিয়াছিল, উপকারক তাহাতে আবার জোর প্রকাশ করিতে যাওয়ায় উপকৃতের চিত্তে একটা বিদ্রোহবুদ্ধি আসা স্বাভাবিক, এবং সেই বিদ্রোহবুদ্ধির ফলে উপকৃত আত্মকৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর না পাইয়া বরং অনেক স্থলে অকৃতজ্ঞের মত আচরণ করিয়া থাকে। আর একটা কথা, যে উপকৃত, তাহার মনে স্বতঃই উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা আসিয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় যদি উপকারক ব্যক্তি "আমি তোমার উপকার করিয়াছি," "আমি তোমার উপকার করিয়াছি" এই কথা উঠিতে বসিতে অনবরতই শুনায়, তাহা হইলে উপকারকের প্রতি তাহার যে ভক্তিপূর্ণ কৃতজ্ঞতা নীরবে আসিয়াছিল, তাহা উপকারকের এই সনির্ব্বন্ধ আত্মবৃত্তখ্যাপনে প্রতিহত হইয়া কেবল যে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাহা নহে, বরং অনেক সময়ে সেই আত্মখ্যাপনের নির্য্যাতনে অশ্রদ্ধা পূর্ণ বিদ্রোহে পরিণত হইয়া থাকে।

"অমুক ভৃত্য প্রভুর নিন্দা করিয়া বেড়ায়," "অমুক লোক অমুক লোককে চাকুরী করিয়া দিল, কিন্তু সে তাহার প্রতি প্রতিকূল আচরণ করিল" এইরূপ কৃতঘ্নতার কথা আমরা যে প্রায়ই শুনিতে পাই, ইহার কারণ আর কিছুই নহে, সেই প্রভু বা সেই চাকুরী দাতার ভৃত্য বা অনুগৃহীত ব্যক্তির প্রতি অসহনীয় প্রভুত্ব প্রকাশ বা উপকারের পরিবর্ত্তে তাহার মস্তক ক্রয় করিবার অভিলাষই ইহার প্রধান কারণ। উপকারক উপকৃতের উপকার করেন বলিয়া তাহার অপমান কর কোন ব্যবহার করিতে পারেন না; করিলেই, তাঁহার পূর্ব্বকৃত সমস্ত উপকার বিলুপ্ত হইয়া ত যায়ই, এতদ্ব্যতীত পরস্পরের ভিতরে অতি ভীষণ শত্রুতাও উপস্থিত হইতে পারে। জগৎশেঠ সিরাজউদ্দৌল্লার আশ্রিত ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু পাপমতি সিরাজ জগৎশেঠের অন্দরমহলের দিকে পাপদৃষ্টি করিয়াছিল বলিয়াই, তিনি সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

উপকারক ও উপকৃতের বিপরীত প্রকৃতি অনেকস্থলে পরস্পরের ভিতর শত্রুতা উৎপাদন করিয়া কৃতজ্ঞতার পথ রুদ্ধ করিয়া থাকে। রামায়ণে দেখিতে পাই, বিভীষণ রাবণের অন্নে প্রতিপালিত ছিলেন; নীচাশয় রাবণ যখন সাধ্বীশিরোমণি সীতাকে হরণ করিয়া রাখেন, ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ রাবণকে এ বিষয়ে বারংবার নিষেধ করিয়াছিলেন; রাবণ কিন্তু তাঁহার কথা শুনেন নাই, তখন ধার্ম্মিক বিভীষণ রাবণের শত্রুরূপে রামের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। এস্থলে বিভীষণের ধর্ম্মময় প্রকৃতি রাবণের পাপময় প্রকৃতির সহিত মিশিতে না পারিয়া রাবণ অন্নদাতা হইলেও অকৃতজ্ঞের মত তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কখনও কখনও উপকার করিয়া উপকারকের মনে একটু তমোভাবের উদয় হয়, যদ্দ্বারা তিনি আপনাকে উপকৃত অপেক্ষা একটু অধিক মহিমান্বিত মনে করেন। এবং উপকৃত ব্যক্তি যখন অবসর মত তাঁহার প্রত্যুপকার সাধনে যত্নবান্ হয়, তখন তিনি আপনার অযোগ্য জ্ঞানে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকেন। ফলে এই দাঁড়ায়, যে তৎকৃত উপকার সাধনে উপকৃত ব্যক্তির মনে যেটুকু কৃতজ্ঞতা উৎপন্ন হইয়াছিল,

এক্ষণে এই প্রত্যুপকারের প্রত্যাখ্যানে উপকৃত ব্যক্তির মনেও তৎকৃত পূর্ব্ব উপকারের প্রত্যাখ্যানের প্রবৃত্তি ঘটায়, ততটুকু কৃতজ্ঞতা আর থাকিতেই পারে না, বরং মনের মধ্যে ক্রমে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বের কৃতজ্ঞতাকে একেবারে সমূলে উন্মূলন-পূর্ব্বক তৎ-পরিবর্ত্তে একটা অকৃতজ্ঞতারই সৃষ্টি করিয়া থাকে।

আবার যদি কেহ কিছু আশা পোষণ করিয়া কাহারও উপকার করে, তাহা হইলে ঐ উপকার স্বার্থমূলক হওয়ায় উপকৃত ব্যক্তির হৃদয় ততটা অধিকার করিতে পারে না, বরং তাহার নিকট হইতে ঐরূপ আর একটী উপকার প্রাপ্তির বাসনা অন্তর্নিহিত থাকায় উহা অনেকটা বিনিময় কারবারের মত প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এই জন্ত যদি কাহারও উপকার করিতে হয়, নিঃস্বার্থভাবেই আপনার কর্ত্তব্যবোধেই করা উচিত। এরূপ করিলেই উপকৃতের হৃদয়ে স্বতঃই কৃতজ্ঞতার উদয় হয়। নতুবা কোন আশা পোষণ করিয়া উপকার করিলে, কিংবা উপকৃতের মস্তবটী ক্রয় করিবার জন্ত উপকার করিলে কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তি সুদূর পরাহত।

যাহাহউক উপসংহারে এই বক্তব্য, যে স্থলে উপকারকের দোষে উপকৃতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অবসর ঘটে না, সে স্থলে উপকৃতকে ক্ষমা করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু যে স্থলে উপকৃত ব্যক্তি নিজ স্বভাবদোষে কৃতঘ্ন আচরণ করে, সে স্থলে সে সম্পূর্ণরূপেই ক্ষমার অযোগ্য। তাই হিতোপদেশকার বলিয়াছেন

"উপকারিণি বিশ্রব্ধে শুদ্ধমতৌ যঃ
সমাচরতি পাপম্।
তং জনমসত্যসন্ধং ভগবতি বসুধে!
কথং বহসি?"

যে অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি উপকারী, বিশ্বস্ত ও শুদ্ধমতি লোকের প্রতি অনিষ্ট আচরণ করে, হে ভগবতি পৃথিবি! তাহাকে কেন বহন কর?

আরও,

"ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চোরে ভগ্নব্রতে শঠে
নিষ্কৃতি বিহিতা সদ্ভিঃ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ।"

সাধুগণ ব্রহ্মহত্যাকারী, মদ্যপায়ী, চৌর, ব্রতভঙ্গকারী ও শঠ সকলেরই প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন, কিন্তু কৃতঘ্নের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

শ্রীভবভূতি বিদ্যারত্ন।

শান্তি-শোভা।

সুনির্ম্মল নৈশাকাশ,
স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্না-হাসি;
গভীর মৌনতা-ভরা—
তৃপ্তিমুগ্ধ শোভারাশি!
ঈর্ষা দ্বন্দ্ব,—বেষে অন্ধ,
কুৎসিত মানব-প্রাণ!

কোথা নিদ্রা যায় হয়ে
বদ্ধগৃহে হতজ্ঞান!
দেখে যা সৌন্দর্য্যরাশি,
শিখে যা শিখে যা কিছু
প্রকৃতির ভাবান্তরে—
কি পার্থক্য কত উঁচু!

এ আলো শুধুই আলো
　　প্রশান্ত আনন্দবহ,
এর কাছে রূঢ় দীপ—
　　কি কঠোর দুর্ব্বিষহ!
সংসারের কাজে তব
　　দীপ বড় প্রয়োজন,—
কিন্তু আহা এ মাধুরী
　　—শান্ত শোভা আয়োজন!—
আমার বেদনাহত,
　　যন্ত্রণা-বিক্ষত প্রাণে,
নিমেষে আনিল শান্তি
　　স্বর্গের অমৃত দানে!

*　　*　　*

থাক্‌রে মর্ত্তের জালা
　　মৃত্যু-বুকে অচেতন,
ওরে প্রাণ চেয়ে দেখ
　　অরূপের সুমোহন
রূপরাশি,—শান্ত হাসি
　　প্রকৃতির অঙ্কাশ্রয়ে
বিজনে উঠেছে ফুটি
　　কত শান্তি-সুধা লয়ে!
বীভৎস উদ্ধত রুক্ষ
　　নিষ্করুণ নরচিত্ত—
রহিল আঁধার কোণে
　　চিরক্ষোভে পরিতপ্ত!

দেহের আহার লয়ে
　　করে ওরা হানাহানি,
প্রাণের আহার্য্য-স্বাদ
　　জীবনে কিছু না জানি!
দেখে না সত্যের শান্তি
　　জানে না-ক জগদীশ,
ওরা শুধু শিখিয়াছে
　　ঈর্ষ্যা দ্বন্দ্ব দ্বেষ বিষ্!

*　　*　　*

যা খুসী করুক্ ওরা
　　যাতে তৃপ্তি পায় মনে,
আঁখি-ভরা ঘুম লয়ে
　　ঘুমাক্ আঁধার কোণে!
ওরে চিত্ত, ফিরা আঁখি,—
　　যন্ত্রণায় আত্ম-ভোলা,
চাস্‌নে ওদের পানে,
　　চাহিলে বাড়িবে জালা!
খুলে দে, খুলে দে হৃদি
　　চেয়ে দেখ আঁখি ভরে—
প্রাণের আরাম আছে
　　ধ্যানে জ্ঞানে বিশ্বজুড়ে!
সংসারের কোলাহল,
　　থাক্ দূরে অন্ধকারে
মুক্ত হ'য়ে মুক্তি-পদে
　　মুক্ত প্রাণে নমস্কারে!

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া।

"সমাজের বর্ত্তমান গতি।"

কোন সাম্প্রদায়িক সমাজ বা লোকবিশেষের সমাজ লইয়া আলোচনা করা সহজ, কিন্তু এই সকল একত্রে লইয়া যে মূল সমাজ গঠিত, এগুলি যাহার অংশ, তাহার আলোচনা করা জটীল সমস্যা। সমাজ অর্থে সমগ্র মানব-জাতির সমাজ, পরস্পর পরস্পরের আদান

প্রদানের সমাজ মাত্র তোমাকেও আমাকে লইয়া সমাজ নহে। সঙ্কীর্ণতার চাপের মধ্যে ফেলিলেই তোমার ও আমার সমাজ হইয়া যাইবে, কিন্তু বিস্তৃতির ক্ষেত্রে এ সমাজের স্থান।

কোন দিকে সমাজের বর্ত্তমান গতি জিজ্ঞাসা করিলে মনের মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উত্তর দুই দিক্ দিয়া উঠিয়া আসিয়া চাপিয়া ধরে—ভাল ও মন্দ। মন্দর দিক দিয়া আলোচনা করিলে অনেক অপ্রিয় অথচ সত্য প্রসঙ্গ তুলিতে হইবে, কিন্তু তাই বলিয়া যতটুকু এই মন্দের ছাপ তাহাকে ও ত বাদ দেওয়া চলে না। সমাজের সব গতিই ত মন্দ নয়, ভালর দিকেই বরঞ্চ গতি বেশী; এজন্য মন্দ ধার ধরিয়া দেখিলে যেমন হতাশ হইতে হয় ভালর দিক দিয়া দেখিলে তদনুযায়ী আশান্বিতও হওয়া যায়।

ভালর দিকৃই অগ্রে দেখা যাউক। বর্ত্তমান সমাজে মানবজীবনের অশেষ উন্নতি সাধন হইয়াছে, বিজ্ঞানের নূতন আলোকে ও নব্য জ্ঞানের অনুশীলনে মন নিয়তই নিযুক্ত। কি সমাজ-সংস্কারে, কি জাতীয়-জীবনের প্রাধান্যে, কি ধর্ম্মের উদারতায়, কি তত্ত্বজ্ঞানের চর্চ্চায় সর্ব্বদিকেই উন্নতির গতি লক্ষিত হয়। উন্নতি অর্থে প্রত্যেক যুবকই জানে, ধর্ম্মে শিক্ষিত হইয়া কিরূপে স্বোপার্জ্জিত অর্থে দাঁড়াইবে এই কল্পে প্রয়াসী—এই উন্নতি কিসে হইবে তাহার জন্য ব্যগ্র মানুষ আর পুরাতনের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আটকাইয়া রাখিতে চাহিতেছে না; সকলেই নূতন নবীনের অন্বেষণে ব্যস্ত। কোন্ মান্ধাতার আমলে শাস্ত্রে লিখিত ছিল সমুদ্রপার নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ হিন্দুসমাজে, কেহ বিলাত গমন করিলেই তাহার সেই দুর্দ্দম পাপের প্রায়শ্চিত্ত গোময় ভক্ষণ—যেখানে এত বড় সঙ্কীর্ণতা ও বাঁধাবাঁধি, যেখানে বিলাতগমন পাপের এরূপ বিচিত্র ব্যবস্থা, সেখানেই অধুনা আর গোময়ভক্ষণ দণ্ডকে আমলে না আনিয়া সকলেই সেই নিষিদ্ধ পুরীতে সাতসমুদ্র তেরনদী পার হইয়া চলিতেছেন। বিদেশীয়দের যতটুকু ভাল তাহা আনয়ন করিয়া তাহার অনুকরণে স্বদেশীয়দের গড়িয়া তোলা এক মহৎ কার্য্য।

বর্ত্তমান যুগই আবিষ্কারের যুগ। সমাজের গতি ক্রমশঃ এই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। বিজ্ঞানের সাড়া পাইয়া বাঙ্গালী সমাজও জাগ্রত; এই সমাজের সন্তানরাই এমন সুন্দর বিজ্ঞানের thesis লিখিতে পারেন যাহার উপযুক্ত সমাদর বিলাতের Scientific Society করিতেছেন। এই সমাজের সন্তানরাই বাণিজ্যে উন্নতি ও শিল্পকলায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেছেন। বাণিজ্যের দিকে এই যে সম্প্রতি যৌথ কারবারি প্রণালী আরম্ভ হইতেছে। এই Joint Stock System ও Co-operation (সমবায় প্রণালী)ই জাতীয় জীবনকে উঁচুতে তুলিয়া লইবার জন্য পথ খুলিয়া দিতেছে। বিজ্ঞানের উদ্ভিদবিদ্যায় (Botanyতে) কে যে বিখ্যাত যন্ত্রাদিসমূহ আবিষ্কার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন তাহা সকলেই বিদিত আছেন। ভাষার উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি—কত মনস্বী লেখকদের লেখনী হইতে সাধিত হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। দৃষ্টান্ত যে, বাঙ্গালা ভাষাই M.A.র পাঠ্যবিষয় হইয়াছে যাহা কোন দিন কার্য্যে পরিণত হইবে কেহ ভাবেন

নাই। মহাসমরের অভ্যুত্থানে ও অবসানে বিজ্ঞানের পথ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। সমরে যে সমুদায় নূতন অস্ত্রশস্ত্র, জাহাজ নির্ম্মাণ, Aeroplane প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী সন্তানরা ভবিষ্যতে নিজেরাই সেই সমুদায় নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন আশা করা যায়। মহাসমরে বাঙ্গালী সন্তানদের যোগদান চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। এ গৌরবকীর্ত্তি অমর। যে বাঙ্গালী-সমাজ আবহমানকাল ভীরুতা ও কাপুরুষতার তিলক ললাটে লইয়া নতমস্তকে ছিল, সেই সমাজই সন্তানদের যুদ্ধে প্রাণ দিবার জন্য প্রেরণ করিয়া নিজের বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইল। সমাজ কোথায় পশ্চাতে ছিল, আর আজ সমাজ কত উচ্চে আসীন। সকলেই নূতন শক্তি-কবচ ধারণ করিয়া বঙ্গমাতার সুসন্তান-নাম ধারণ করিতে সক্ষম।

সমাজ সংস্কারের সম্বন্ধেও উদাসীন নহে। যেখানে অসবর্ণ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল, সেই হিন্দুসমাজেই সহস্র নরনারী একত্রে মিলিত হইয়া পেটেলের অসবর্ণ বিল অনুমোদনে দাবী করিতেছেন। যে সমাজ চিরকাল এক রেখার সীমার মধ্যে অবস্থান করিতেছে, যাহার সীমার সূচ্যগ্র বিন্দু অতিক্রম করিলে শাস্ত্র লঙ্ঘন হয়, সেই সমাজেই এই উদারতা আসিয়াছে। যে সমাজে জাতিভেদ বংশানুগত চলিয়া আসিতেছে, সেই সমাজেই এই জাতির মিলনের ব্যবস্থা। আর ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদাভেদ থাকিবে না। বর্ত্তমান সমাজের গতিই বর্দ্ধনশীল, অর্থাৎ progressive, ইহাই বিশেষত্ব। হিন্দু মুসলমানে একতা—জাতীয় জীবনের উন্নতির লক্ষণ।

অধুনা ধর্ম্মে উদারতা ও সেবায় তৎপরতার পরিচয় বহুপরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু উদারতা সকল ধর্ম্মসমাজে নাই, এখনো অনেক সমাজ সেই গণ্ডীর মধ্যেই আছে। ধর্ম্মে অনুরাগ সম্বন্ধে আলোচনা আমার অনধিকার চর্চ্চা। তবে সমাজে দুর্নীতির প্রশ্রয়ই অধিক, এ সম্বন্ধে বিশেষ বলিতে চাই না। সুখের বিষয় এই যে মদ্যপান নিবারণ ও ধূমপান নিবারণ সভা হওয়াতে দেশের ও সমাজের নীতি যে অনেক ভাল হইবে এইরূপ বোধ হয়। সেবায় তৎপরতার প্রমাণ ভূরি ভূরি পাওয়া যায়। দুর্ভিক্ষে শত শত নরনারীর বস্ত্র ও অন্নকষ্ট মোচন করিতে সকল যুবকই প্রাণদানে উৎসুক, সকলেই স্বেচ্ছাসেবক হইয়া বস্ত্র ও অন্নদানে ব্যস্ত, দাতা ও এই বাঙ্গালী সন্তান, কর্ম্মীও তাহারাই—যথা ব্রহ্মসমাজ, সেবকদল, রামকৃষ্ণমিশন, মাড়োয়ারী ও খৃষ্টান জনসভা।

রাজনৈতিক চর্চ্চার হিসাবে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই সংশ্রব রাখেন। এই যে Joint Bill পাশ, স্বায়ত্তশাসনের দাবী ও League of Nations বা জাতীয়সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা,—মহাসমরের অবসানের এই বৃহৎ ব্যাপারসমূহের সহিত প্রত্যেকের স্বার্থ জড়িত। নরনারী সমভাবে শিক্ষিত না হইলে কখনও স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হইবে না। যদিও নারীদের শিক্ষা উদ্যমে চলিতেছে, তথাপি আরো শিক্ষিতা নারীর প্রয়োজন। নারীদের ভোটের দাবী—এবং ইহার সমর্থন এমন কি কলিকাতার মিউনিসিপাল সভায় এই প্রসঙ্গের আলোচনায় মনে হয় দেশের ব্যক্তিদিগের নারীদিগের উপর আস্থা বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা কম আশার কথা!

এই শিক্ষার বিস্তারের সম্বন্ধে নারীশিক্ষায় ব্রাহ্মসমাজের কথা আসিয়া পড়ে। শিক্ষা অর্থে মাত্র লেখাপড়া করা নহে. বিশেষতঃ আমাদের মেয়েদের লেখাপড়ার সহিত যেমন চিত্র-বিদ্যা গীতবাদ্যাদি শিক্ষা করা প্রয়োজন, তেমনি গৃহকর্ম্মে, সেলাই ও রন্ধনেও নিপুণা হওয়া প্রয়োজন। তবেই আমাদের শিক্ষা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে। আমরা কিন্তু লেখাপড়া শিখিয়া যেন এই ভাব পোষণ না করি যে পুরুষের উপরে উঠিয়াছি, তাহাদের সমকক্ষ হইলেও চিরকাল তাহাদের নীচেই আমাদের আসন থাকিবে। আমাদের নারী-সুলভ লজ্জা ও কোমলতাই আমাদের এই নম্র ভাব প্রদান করে, নিজেরা গর্ব্বিতা হইয়া তাহা হারাইয়া উদ্ধত প্রকৃতির হইয়া পড়ি। এই যে দুর্ণাম মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলেই বিলাসী ও গর্ব্বিতা হয়, তাহারা উচ্চশিক্ষার ফলে গৃহকর্ম্ম ও নম্রতা ভুলিয়া যায়, আমরা এই দুর্ণাম লইতে প্রস্তুত নহি। যাঁহারা ধনী-কন্যা তাহারা বিলাসী ও গর্ব্বিতা হইতে পারেন কিন্তু যাঁহারা মধ্যবিত্ত ব্যক্তির কন্যা তাহারা গৃহকর্ম্মেও উদাসীন নহে।

আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বর্ত্তমান সমাজের গতি ভালর দিকে নাই, ইহা অপেক্ষা পূর্ব্বের সমাজের আচার ব্যবহার ভাল ছিল। এখন কেবল Westernized বা পাশ্চাত্যদেশীয় অনুকরণ। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতের বদলে হাত দিয়া নমস্কার, সাদর কোলাকুলির বদলে handshake, বাবুর বদলে Mr. ইত্যাদি, পোষাক পরিচ্ছদে সকল বিষয়েই বৈষম্য দেখা যায়। এ সকল কোন ব্যক্তিগত সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণ করিয়া বলিতেছি না, সমগ্র সমাজের গতিই এই দিকে চলিতেছে।

সকলের অপেক্ষা দুঃখের বিষয় যে, সমাজের বর্ত্তমান গতি যেন ক্রমশঃ, মেকী, বুজরুকী ভাব লইয়া চলিতেছে, যাহাকে hypocrisy বলিতে পারি। এই বুজরুকী বা এক কথা মুখে বলিতেছি ও কাজে অন্যরূপ করিতেছি, সর্ব্বত্রই দেখা যায়। কি ধর্ম্মে, বাণিজ্যে, দৈনিক জীবনে, যেন এই ভাবই গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। ধর্ম্মে পুরোহিত কটং কটং মন্ত্র উচ্চারণ করেন, কিন্তু সেই মন্ত্রের গূঢ় অর্থ কি, বা তাহার সহিত আধ্যাত্মিক যোগ কতটা তাহা জ্ঞাত নহেন; তথাপি ইহাঁর উপর শত শত নরনারীর প্রবল আস্থা। বাণিজ্যে যত রকম মেকী করা যায় তার পন্থা, টাকা প্রভৃতি সবেতেই কৃত্রিম ধাতু রূপার বদলে মিশান, দৈনিক বাজারের দ্রব্যাদিতে ভেজাল, এই যেন ব্যবসা হইয়াছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এই মেকী, যাহা বলিতেছি তাহা করি না, বাহিরে আমি ধর্ম্মপরায়ণ, ভিতরে আমার ন্যায় এত বড় অধর্ম্মী আর নাই। এই যে গতি বা tendency, ইহা আমাদের সকল দিকেরই অবনতির কারণ। খাঁটী, শুদ্ধতা, সরলতার স্থান নাই; কৃত্রিমতা, মেকী, বুজরুকী দিয়াই সমাজ ক্রমশঃ সমাদর প্রাপ্ত হইতেছে।

শেষ কথা এই যে যাহা মন্দ তাহার ভিতর হইতেই ভালকে আনিতে হইবে। বিষে যেমন জীবন নাশ হয় তেমনি তাহা হইতে Antidote বা প্রতিষেধক বাহির করিয়াও অনেক সময়ে জীবন রক্ষা হয়।

তেমনি মন্দের দ্বারা ভালতে আনিবার পথ হয়। দাঁড়িপাল্লার ওজনে যদি ভালর গতি বেশী হয় তবে ভবিষ্যৎ ত আশাপ্রদই।—যাহা মন্দ আছে তাহা দর্শনে হতাশ হইবার কিছুই নাই, কারণ চিরকালই মন্দর ভিতর হইতেই ভালর সৃষ্টি হইয়াছে, হইতেছে ও হইবেই।

শ্রীমতী মণিকা রায় চৌধুরী।

যাত্রার ফল।

১

সেবার ডেপুটিবাবু মোহিতকুমার চুঁচুড়ায় বদ্‌লি হইয়া আসিয়া ছিলেন। স্ত্রী শরৎশশীর পিত্রালয় বর্দ্ধমানে, সুতরাং স্বামী চুঁচুড়ায় বদ্‌লি হওয়ায় তাঁহারই আনন্দটার মাত্রাধিক্য হইয়াছিল। না হইবেই বা কেন? সবে দুটি ছেলের মা, সুতরাং বাপের বাড়ীর উপর এখনও পুরামাত্রায় টান, তাছাড়া পিত্রালয়ের বন্ধন ও আদর যত্নের সবই বর্ত্তমান ছিল, শরৎশশীর পিতা সঙ্গিতশালী ব্যক্তি। কিন্তু যেমন চাঁদে কলঙ্ক, কুসুমে কীট, তেমনি সুখের সঙ্গে দুঃখও চির মিশ্রিত; শরতের ছেলে দুটিকে ম্যালেরিয়া আক্রমণ করিল। জন্মিয়া অবধি তাহারা পিতার সহিত পশ্চিমে ঘুরিতেছে; বাঙ্গলার প্রথম বর্ষার হাওয়া যেমন গায়ে লাগা, পশ্চিমের স্বাস্থ্য কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। ললিত পড়িবার বই দুয়ারে বন্ধ করিয়া ইস্কুলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, শরৎশশীর শীতের লেপগুলি অসময়ে বাঁশের দোলনা হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইল। একটা দুইটা করিয়া লেপগুলি ঘাড়ে চাপাইয়াও সে কাঁপুনীর ধুম থামে কি! বাঙ্গলার আর কিছুর বিক্রম থাক্ না থাক্, জ্বরের বিক্রম সকলকেই ঘাড় হেঁট করিয়া মানিতে হইবে।

ছোট সরিৎকুমার বেচারীর প্লীহা যকৃৎও রীতিমত বাড়িয়া গেল, চিকিৎসক মহাশয়ের ডেপুটি বাবুর বাড়ীর সাদর নিমন্ত্রণ উপস্থিত মত পাকা হইয়া গেল; কিন্তু শরৎশশী ছেলে দুটি লইয়া বড়ই চিন্তাকুল হইল। পাড়াগাঁয়ের "মা" রা জানেন ছেলে ভোগাই স্বাভাবিক অবস্থা, ভাল থাকাই আশ্চর্য্য! তাই যতক্ষণ ছেলে দাঁড়াইয়া থাকে, ততক্ষণ তাঁরা রোগে ভয় করেন না, কিন্তু যে মা বাঙ্গলার এ আস্বাদ এখনও অনবগত আছেন যাঁহারা সন্তানের সামান্য অসুখে দিশেহারা হ'ন্ তাঁহারা নুতন যখন এ বিপদে পড়েন, তখন ভাবনার কুল কিনারা পান না। ছেলেরা ত রোগে পড়িল, শরৎশশী প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। কিন্তু আরও কষ্ট হইল মোহিতকুমারের, চিরদিন শরৎশশী স্বামীর ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কর্ম্মই নিজ তত্ত্বাবধানে করিয়া আসিয়াছে ইহাতে সময়ে সুশৃঙ্খলে কাজও হইয়াছে, এবং সকল কাজেই মধুরহাসিনী প্রিয়ার সঙ্গ সুখও ঘটিয়াছে এখন শরৎশশী সকল কাজেই প্রায় অনুপস্থিত সুতরাং তাঁহার "পানে চূণ ব্যঞ্জনে নু"ন প্রায়ই ঘটিতে লাগিল; কিন্তু করেনই বা কি! রুগ্ন ছেলেরাও মাকে একটু ছাড়ে না।

'বিধির মার ছনিয়ার বার' সহ্য করা ছাড়া উপায় বা কি ?

বড়দিনের ছুটির আগে মোহিত এলাহাবাদ হইতে একখানি পত্র পাইলেন ; বন্ধু নীরদচন্দ্র লিখিতেছে "তুমি বোধহয় শুনিয়া থাকিবে নবেম্বর মাসে অধর বিলাত হইতে ফিরিয়াছে, বড় দিনের সময় আমরা সকল বন্ধু-বান্ধব মিলিয়া সে জন্য মিলনোৎসব করিব স্থির করিয়াছি। তুমি আমাদের সকল কাজের নেতা সুতরাং এ কাজেও তুমি না উপস্থিত থাকিলে শিবহীন যজ্ঞের মত শোভাহীন হইবে ; বিশেষ অধরের বিদায় আয়োজনে তুমিই অগ্রণী ছিলে, এখনও আমরা তোমাকে সেই স্থানে পাইতে চাই, নিতান্ত উৎসুক হইয়া সকলে পথ চাহিয়া রহিলাম আসিতে অন্যথা না হয়।"

শরৎ চিঠি শুনিয়া বলিল "যাবে নাকি ?"

"তা আর যাব না! এখানে এসে অবধি প্রাণটা যেন খাবি খাচ্ছে, আমোদ আহ্লাদ মাথায় উঠেছে কেবল দিনরাত অসুখ আর ডাক্তার নিয়ে জীবন অন্ত ; ছদিন একটু হাওয়া বদ্‌লে আসা যাক্।"

"হাওয়া বদ্‌লানটা তোমার একারই বা হয় কেন ? সকলেরই তো সেটা প্রয়োজন হয়েছে।" "কি বল শরৎ! এই সব রোগা ছেলেপিলে এই হিমে শীতে আমি ওদের এলাহাবাদ নিয়ে যাব ? তোমার ত সাহস কম নয়! সেখানে ত আর সে নিকুঞ্জ-কুটির সাজান নেই, তল্পিতাল্পা ত সব তুলেই নিয়ে এসেছি ; গিয়ে হাওয়াটা খাবে কোথায় দাঁড়িয়ে ?"

অভিমানে চারু অধর আরক্তিম করিয়া শরৎ উত্তর করিল "আমি কোথাও যাবার নাম কর্‌লেই তোমার যত ছুতো ; থাক্‌বার স্থানের ভারী ভাবনা কি না! আমায় যেন ছেলে ভোলাচ্ছেন ; নিজে কোথা থাক্‌বে বল দেখি ?"

শরতের মনের সুর দেখিয়া মোহিত একটু নরম হইতে চেষ্টা করিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে কি সব কাজে তোমার তুলনা হয় ? তোমরা যে ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাবার জিনিষ ; এ রোদ পোড়া তাত সওয়াদের সঙ্গে তোমাদের কথা ?"

"ভয় নেই আমি তোমার সঙ্গে এলাহাবাদ যাব না, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গ ছাড়্‌চি না, বড় দিনের সময় ছেলেদের নিয়ে আমিও ছদিন বেড়িয়ে আস্‌ব, আমাকে কাশীতে রেখে যেও।"

"কাশীতে ? কার কাছে ?"

'মাসিমার বাড়ীতে ; তাঁরা এবার পূজার পরে তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়েছেন ফাগুন মাসের আগে ফির্‌বেন না। পূজার সময়েই লিখেছিলেন আমি চ'লে গেলেও বাড়ী ঘর লোকজন সবই রইল, তুমি স্বচ্ছন্দে এস ; তখন ত বাবা বর্দ্ধমানে নিয়ে গেলেন, এ ছুটিটায় কিন্তু আমি কাশী না গিয়ে ছাড়্‌চি না।"

মোহিত কুমার গালে হাত দিয়া বসিলেন, কাতরতার ভান করিয়া বলিলেন "শরৎ তোমার সঙ্গে আমার এত শত্রুতা ও ছিল!" "হাঁসিয়া শরৎশশী কক্ষান্তরে চলিয়া গেল ; সে বুঝিল স্বামির আর আপত্তি কিছু নাই।

কিন্তু মোহিত যে নিতান্তই একটু ক্ষুণ্ণ না হইল, তাহা নহে ; ডেপুটি বাবু হইলেই বা কি ! সরিৎ ললিতের পিতা হইলেই বা কি ! বয়স মোটে ২৭।২৮ বইতো নয় ! এ বয়সে আমোদ আহ্লাদ যত প্রিয়, সংসারের ঝঞ্ঝাট বা রোগের হাঙ্গামা সহ্য করার কর্ত্তব্য-জ্ঞান তত মধুর নয়। দুদিন এসব বোঝা ফেলিয়া রাখিয়া আনন্দ করিতে পাইবে ভাবিয়া মনটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিতেছিল, কিন্তু শরৎশশী আবার এক ফ্যাসাদ উপস্থিত করিল, এমন সময় টুপি কম্ফর্টার গরম কাপড়ে মোড়া ললিত বাবু শুষ্কমুখখানি লইয়া পিতার কোলের কাছে দাঁড়াইল ; মোহিত কুশার জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ কেমন আছিস্ ললিত ?"

একটু খানি মাথা ধরে আছে বাবা।" "দেখি হাত টা", সযত্নে পুত্রের দুর্ব্বল হাতখানি নিজহাতে তুলিয়া লইয়াই একটা নিশ্বাস পড়িল, "আহা কি চেহারাই হ'য়ে গ্যাছে, কি ক্ষণেই চুঁচুড়ায় এসেছিলুম !" হাত দেখিয়া বলিলেন "তাইতো এখনও ত জ্বর আছে !" পরে ললিতকে কোলে তুলিয়া বসাইয়া বলিলেন "ললিত বেড়াতে যাবি ?" "কোথায় বাবা ?"

"রেলগাড়ী চ'ড়ে।" সোৎসাহে ললিত বলিল "খুব যাব বাবা, সরিৎ ও যাবে তো ? আর মা ?" হাসিয়া মোহিত বলিলেন "তুই কি এত বড় বীর-পুরুষ হয়েছিস্ ললিত, যে এখনই মার আঁচল ছাড়বি ?" "কবে যাব বাবা ?"

"সেখানে গেলে বেশ ভাল হ'য়ে যাবি তো ?"

পরমোৎসাহে ললিত বলিল 'খুব ভাল হব বাবা।" রুগ্ন পুত্রের অনুসন্ধানে শরৎশশী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; পুত্রের উৎসাহ-প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন "কিসের পরামর্শ চল্‌ছে বুঝি ! নইলে ললিত বাবুর এত স্ফূর্ত্তি দেখ্‌ছি যে ! কিন্তু মানেটা আমি বুঝে নিয়েছি, ললিতদের ভুলিয়ে রেখে যাবার ফন্দি।" হাসিয়া মোহিত উত্তর করিল "না গো না, তুমি তো আমার কেবল দোষই দেখ ; ললিতকে জিজ্ঞাসা করছিলুম সে বেড়াতে যাবে কিনা ?" ললিত পিতার কোলে থাকিয়াই উত্তর দিল "শুধু আমিই একা নই মা তুমিও—সরিৎ ও—" "শরৎ স্বামির মুখে কৌতূহল দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া বলিল "তা হ'লে সত্যিই নিয়ে যাবে ?" তখন মোহিতের অন্তঃকরণ পুত্র স্নেহের প্রাবল্যে ভরিয়া গিয়াছে, তাহার কাছে আমোদ আহ্লাদ, বন্ধু বান্ধব, বা রোগের ঝঞ্ঝাটের ক্লেশ সব তুচ্ছ। স্ত্রীর সহাস্য দৃষ্টির বিনিময়ে তেমনি মধুর দৃষ্টি প্রয়োগ করিয়া মোহিত বলিল "তা নয় তো কি ! এতো আর তোমার অসুখ নয় যে প'ড়ে প'ড়ে ভুগলেই বা ; এ আমার ললিত সরিৎ, তাদের আমি রেখে যেতে পারি ?" "তা আর জানিনে ; ললিত সরিতের মার অসুখ হ'লে মহাশয়ের ধৈর্য্যের পরীক্ষা অনেক দেখেছি"—বলিয়া মধুর হাসি ছড়াইয়া শরৎ চলিয়া গেল। সমস্ত গৃহখানি, বিশেষ মোহিতের অন্তর সেই সুধা-বৃষ্টি হাসি-বন্যায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

২

"ওগো আর বেশী সময় নেই তোমার এখনও হ'ল না ?"

"এই যে ছেলেদের দুধ্ টুধ্ গুলো ঠিক ক'রে নিচ্চি; ওরে হরে, সরিৎকে টুপিটা পরিয়ে দে।"

সুসজ্জিত মোহিত বাবু গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন "তোমার যে এখনও কাপড় চোপড় কিছুই পরা হয় নি দেখ্‌চি; তুমিই মাটি করবে! "মাহেন্দ্রক্ষণ"টা তোমার জন্তই ফস্কে যাবে। তারপর যা, তা জান তো?"

"জানি জানি তোমার আর সে নাম করতে হবে না" ললিত পিতার হাত ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে বলিল "সে কি বাবা আমায় বল না?"

ঈষৎ হাস্যে মোহিত বলিল "বল্‌লে তোর মা আমায় মারবে" বলিয়া শরতের দিকে চাহিল, কিন্তু শরতের কার্য্য দেখিয়া মোহিত জ্বলিয়া গেল, তখনও শরৎ ট্রাঙ্কে প্রাণপণ চাপ দিয়া জিনিষ পুরিতেছে। বিরক্ত হইয়া মোহিত বলিয়া উঠিল, "এখনও তোমার জিনিষ গোছানই হ'য়ে উঠ্‌ল না, তা তুমি অশ্লেষা মঘায় যাবে না ত কি হবে; নিজে যা খুসী করগে, রোগা ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্চ সেজন্তও ত ভাবতে হয়।" শরৎ তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল "সময়ের ঠিক আমার ভালই আছে, তুমি মিছি মিছি ব'কনা দেখি; তোমার মত বাড়ী থেকে অর্দ্ধেক ফেলে ছুড়ে রেখে, বেরিয়ে গিয়ে শেষে ষ্টেশনে বসে থাকা আমার ভাল লাগে না! আমি ঠিক সময়ে ষ্টেশনে হাজির হব, ততক্ষণ তোমার তর্ না সয়, তোমার তো বন্ধুরত্ন আছেন তাঁকে নিয়ে এগিয়ে পড় গিয়ে; তোমার তল্পিতাল্পা তো আলাদা করেই গুছিয়ে রেখেছি।"

ব্যস্তবাগীশ মোহিতকুমার শরতের কথা শুনিয়া চটিয়া গেল, অথচ জানে স্ত্রীর তর্কে তাহাকে পরাস্ত করা অসম্ভব। শরৎশশী যে যথা সময়ে প্রস্তুত হইবে ইহাও ঠিক, কিন্তু মোহিত নিজে তৈয়ার হইয়া অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারে না, ইহাও ঠিক। তার উপর 'মাহেন্দ্রক্ষণে' যাত্রা করিতে হইবে; গম্ভীর হইয়া মোহিত বলিলেন "সেই বেস্ তোমার যখন ইচ্ছা এস, আমি অমরের কাছে চলিলাম।" ছেলেরা চেঁচাইয়া উঠিল "বাবা আমরাও যাব।"

"তোরা মার সঙ্গে আসিস্" বলিয়া মোহিত বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল, চাকরদের আজ্ঞা দিল "আমার জিনিষপত্র গাড়ীতে উঠাইয়া দে।"

মোহিতের উকীল-বন্ধু অমরও সে দিন এলাহাবাদ যাইবে, সেখানে তাহার শ্বশুরবাড়ী। সে স্ত্রীকে আনিতে যাইতেছে অমরের পিতা-মাতা কলিকাতায় থাকেন, সে এখানে ওকালতী করে। মোহিত যেমন ব্যস্তবাগীশ, সে তেমনি ঢিমে; বাড়ীতে বসিয়া শরতের সহিত বচসা করা অপেক্ষা অপরকে তাগাদা দিয়া প্রস্তুত করাইতে পারিলে একটা কাজ হইবে, ভাবিয়া মোহিত স-সরঞ্জাম রওনা হইল। এক, ষ্টেশনে টিকিট ও লগেজের সাহায্য ছাড়া শরৎশশী যে মোহিতের আর কোন ধার ধারিত না সে বিষয়ে মোহিত নিশ্চিন্ত ছিল।

শরৎ যখন শুনিল মোহিত যথার্থই চলিয়া গেলেন, তাহার তখন বড় রাগ হইল এমন মানুষও ত দেখি নাই, আচ্ছা আমিও দেখিব।"

মোহিত বন্ধুর বাড়ী গিয়া দেখিল অমর প্রাতেই কলিকাতা চলিয়া গিয়াছে, সেখান হইতে এলাহাবাদ যাইবে, অগত্যা একাই ষ্টেশনে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

শরতের আসিতে যত দেরী হয় মোহিত তত রাগে। শেষে শরৎ ছেলেপিলে লোকজন লইয়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল; মোহিত খুব রাগ দেখাইবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু শরতের দিকে চাহিতেই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল "খুব রাজা রাজড়ার চাল শিখেছ যাহক্, সেই থেকে একা ব'সে ব'সে হায়রাণ হ'য়ে পড়লুম!" "সে কি আমার দোষ?" বলিয়া শরৎও হাসিল "কিন্তু আমি তো কথা কব না, আমাদের তো তুমি ফেলে এসেছ, যার লোভে ফেলে এলে, সে বন্ধুরত্ন কি হল?" "যাকে নিজের স্ত্রীই আমল দেয় না, তাকে বন্ধু এমনিই আদর ক'রে থাকে! সে হতভাগা আমায় লুকিয়ে কল্‌কাতা চলে গেছে; যাক্ আমার কিছু সঙ্গে দিতে ভোল নি তো?"

"না গো না; যে রকম গুছিয়ে দিয়েছি তুমি বিলেত অবধি ঘুরে আস্‌তে পার।"

এদিকে ট্রেণ আসিয়া পড়িল ছেলেরা আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল।

রাত্রে মোহিতকে খাবার দিতে গিয়া শরৎ জিজ্ঞাসা করিল "হ্যাগা তোমার টিফিন্ কই?

"আমি তা কি জানি? তুমি গুছিয়েছ তুমিই জান।" "বাঃ আমি গুছিয়েছি ব'লে হারালেও আমি জানি? তুমি তো নিজের জিনিষপত্র আগে থাকতে নিয়ে স'রে পড়লে"।

"তা ব'লে আমি তো আর রাস্তায় ফেলে দিয়ে আসি নি!" "না হয় লোকের বাড়ীতেই ফেলে এসেছ, নাও, এখন বেস্ হ'ল; অনর্থক জিনিষটা হারালে, তার উপর এতগুলো খাবার নষ্ট হল।" বিরক্ত হইয়া মোহিত উত্তর করিল "এইসব মথা অপ্লেষা ঘাড়ে ক'রে বেরুলে এম্‌নিই হ'য়ে থাকে; ওই জন্মে তোমাদের নিয়ে বেরুতে চাইনে।" "বাঃ রে উল্টো চাপ! মথা অশ্লেষা পাছে ঘাড়ে পড়ে ব'লে আগে থাক্‌তে বেরিয়ে পড়্‌লে, অমন মিছি মিছি দোষ দিওনা বল্‌ছি।"

"মিছি মিছি দোষ দেওয়া কি? বলুম হাজারবার ওগো শিগ্‌গির করে নাও, যাত্রার সময় বেশীক্ষণ নেই, তা তোমার রাজ্যপাট আর সাম্‌লান হয় না; এই টিফিন্‌কেস্ দিয়ে আরম্ভ হল নিজের এক গুঁয়েমীর ফল ভাল ক'রে ভুগ্‌বে অখন।"

শরতের ভারী রাগ হইল, সে মোহিতের কথার আর কোন উত্তর না দিয়া পিছন ফিরিয়া সকলের খাবার সাজাইতে লাগিল, ছেলেরা রাত্রের মত একটু করিয়া দুধ ও বিস্কুট খাইয়া লইল, মোহিতের ডিস্ সাজাইয়া লইয়া শরৎ চাকরদের বলিল "এতে যা খাবার আছে তোরা দুজনে ভাগ করে খেয়ে ফেল্।" মোহিত জিজ্ঞাসা করিল "আর তোমার?" "আমার খিদে নেই।" "কেন? রাগ ক'রে?" বিষণ্ণ মুখ করিয়া শরৎ উত্তর করিল "কার উপর রাগ করব যে অযাত্রা কুযাত্রা, লোকের ঘাড়ের বোঝা তার আবার রাগ অভিমান কি!"

ঈষৎ হাসিয়া মোহিত বলিলেন "তবু আছে বৈ কি! অন্য কারও উপর থাক্ না

থাক্ খাবারের উপর খুব আছে।” শরৎ কথার উত্তর না দিয়া অন্ত দিকে মুখ ফিরাইল, মোহিত নিজের খাবার দুই ভাগ করিয়া বলিলেন “তুমি অর্দ্ধেক নাও।” “না গো আমি আজ কিছু খাবনা বল্‌ছি; ক্ষিধে থাক্‌লে আমি ওই থেকে খেতে পার্‌তুম না?”

মোহিত হাতের ডিস্ নামাইয়া রাখিয়া সরিয়া বসিলেন; তখন শরৎ ব্যস্ত হইয়া বলিল “ও কি?” “অমন হতশ্রদ্ধার জিনিষ আমি খাইনা” বলিয়া মোহিত মুখখানা আরও ঘুরাইয়া লইলেন, মোহিতকে জব্দ করিবার অনেক উপায় শরতের জানা থাকিলেও শরৎশশীকে জব্দ করিবার এমন উপায় আর ছিল না, নিজের ব্যবহারে শরৎ তখন মরমে মরিয়া গেল, অনুনয় করিয়া বলিল “আমি দোষ স্বীকার কর্‌ছি মাপ্ কর, এই আমি হাত পাত্‌লুম, তুমি আমায় তুলে দাও আমি খাচ্ছি”। মোহিত তখন শরতের হাতে খাবার দিতে দিতে বলিলেন “এখন পথে, এস দেখ শরৎ সকল জিনিষেরই একটা সীমা আছে, পুরুষদের পরের অধীনতা এত কর্‌তে হয়, যে ঘরের ভেতরও সে বোঝা বইতে হ’লে ধৈর্য্য থাকে না, বিশেষ জান ত লোকে রাগ ক’রে খায় না, আমি রাগ দেখ্‌লে খেতে পারি না।” “যার এ রকম অভ্যাস, তার অপরকে রাগানও উচিৎ নয় তুমি মশায় ‘মাহেন্দ্র ক্ষণে’ বাড়ী থেকে পা বাড়িয়ে, বন্ধুর সঙ্গ হারালে, জলখাবারের বাক্স হারালে আর অযাত্রা ব’লে গাল দিলে আমাকে, তবু যদি আমায় সঙ্গে ক’রে রাস্তায় বেরুতে!”

“আচ্ছা ঘাট মান্‌ছি কিন্তু তোমারও একটা দোষ স্বীকার কর, সব তাতেই নিজের ইচ্ছে চালাও, আমার কথা আমলেই আন না।” শরৎ অর্দ্ধভুক্ত খাবার দেখাইয়া বলিল “বটে! তবে এটা কি? কার ইচ্ছায় খাচ্ছি!”

“ও একটা মাত্র; তাও আমি না খাওয়ার ভয়ে”। “যে নিন্দে কর্‌বে তার ছলছুতার অভাব হয় না, কিন্তু আমি তোমার ওকথা মানিনে; তোমার অন্যায় কথা না শুন্‌তে পারি, ন্যায্য কথার কখন অবাধ্য হইনি; সে তুমি যা বল।”

হাসিয়া মোহিত বলিল “কান মলব ভাব কর্‌ব” “তা বেস—” শরৎ কি বলিতে যাইতেছিল, গাড়ী ষ্টেশনে দাঁড়াইল, মোহিত জানালার ধারে গিয়া মুখ বাড়াইল, শরৎ মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। *

শ্রীমতী ননীবালা দেবী।

---

* ভুলক্রমে প্রথম অংশটুকু লেখিকা পাঠান নাই। পরে ছাপা হইয়া যাইলে পর প্রথম অংশটুকু পাঠাইয়া দেন। এজন্য ইহা শেষেই ছাপা হইল।

গানের স্বরলিপি।

সিন্ধুড়া মিশ্র—দাদরা।

ফাগুনের পূর্ণিমা নিশি,
ফাগ ফুটেছে গগন গায়,
যে দিকে চাই ফাগের হাসি—
ফাগ-যমুনা বহে যায়।
ফাগের কুঞ্জে ফাগ মাখান,
ফাগ দেখি লতাপাতায়;
ফাগের লালে গোকুল আকুল—
রাধা ফাগে ঢেউ খেলায়।

নীল গগনে চাঁদ উঠেছে,
ফাগ মেখে লায়া গায়;
ফাগ বসনে বিনোদিনী—
চাঁদ লুকাল তাঁর আভায়।
ফাগে রাঙ্গা কাণুর বেণু
সুধা সুরে 'রাধা' গায়;
ফাগুয়ারি এ নিত্য লীলা—
কে দেখবি ছুটে আয়॥

রচয়িতা—অজানা। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

আস্থায়ী।

০ ১ ২ ৩
II -া সা রা। মা পা -া। র্সপা -া -া। ধা পা -া I
০ ফা গু নের্ পূ র্ ণিমা ০ ০ নি শি ০

০ ১ ২ ৩
I -া মা জ্ঞা। -রা সা রা। গা গাঃ -মঃ। মা -া -া I
০ ফাগ্ ফু ০ টে ছে গ গ ন্ গা ০ য়

০ ১ ২ ৩
I -া পা র্সা। র্সা র্সা -া। ধা পা -া। ধা পা -া I
০ যে দি কে চা ই ফা গে র্ হা সি ০

০ ১ ২ ৩
I -া মা জ্ঞা। -রা সা রা। গা গাঃ -মঃ। মা -া -া II
০ ফাগ্ য ০ মু না ব হে ০ যা ০ য়

অন্তরা।

০ ১ ২ ৩
II -া মা পা। গা -মা মা। পা -না না। র্সা র্সা -া I
০ কা গের্ কু ঞ্ জে ফা গ্ মা খা ন ০

০ ১ ২ ৩
I -া র্রা -র্জ্ঞা। র্রা র্সা -া। না না -র্সা। র্সা র্সা -া I
০ ফা গ্ দে খি ০ ল তা ০ পা তা য়

০ ১ ২ ৩
I -া র্সা র্রা। র্রা র্রা -া। ণা র্সা -ণা। ধা পা -া I
০ ফা গের্ লা লে ০ গো কু ল্ আ কু ল্

০ ১ ২ ৩
I -া মা জ্ঞা।] রা সা -রা। গা -া গা। মা -া -া II
০ রা ঙা ফা গে ০ ঢে উ খে লা ০ য়

সঞ্চারী।

০ ১ ২ ৩
II -া সা রা। মা মা -া। পা -া পা। পা পা -া I
০ নীল্ গ গ নে ০ চাঁ দ্ উ ঠে ছে ০

০ ১ ২ ৩
I -া ণা -া। ধা পা -া। মা মা -পা। পা -া -া I
০ ফা গ্ মে খে ০ সা রা ০ গা ০ য়

০ ১ ২ ৩
I -া র্পা র্রা। র্রা র্রা -া। ণা র্সা -া। ধা ণধা -পা I
০ ফাগ্ ব স নে ০ বি নো ০ দি নী০ ০

০ ১ ২ ৩
I -া পা ধা। না না -া। ধা -না র্সা। র্সা -া -া II
০ চাঁদ্ লু কা ল ০ তাঁ র্ আ ভা ০ য়

আভোগ।

০ ১ ২ ৩
II -া র্পা র্রা। র্রা র্রা -া। র্রা র্জ্ঞা -া। র্রা র্জ্ঞা -র্রর্সা I
০ ফা গে রা ঙা ০ কা নু র্ বে ণু ০০

০ ১ ২ ৩
I -া র্সা র্রা। র্সা র্সা -া। না না -া। র্সা -া -া I
০ সু ধা সু রে ০ 'রা ধা' ০ গা ০ য়

০ ১ ২ ৩
I -া র্সা র্পা। র্পা র্পা র্পা। র্মা র্জ্ঞা -া। র্রা র্সা -া I
০ ফা গু য়া রি এ নি ত্য ০ লী লা ০

০ ১ ২ ৩
I -া মা -পা। মা জ্ঞরা -সরা। গা গাঃ -মঃ। মা -া -া II II
০ কে ০ দেখ্ বি০ ০০ ছু টে ০ আ ০ য়

মন্তব্য।

গানটির সুর তারার "পঞ্চম" পর্য্যন্ত চড়িয়াছে। যাঁহাদের অত চড়া পর্য্যন্ত গলা চড়াইবার সাধনা নাই, তাঁহাদের পক্ষে কিছু অসুবিধা ঘটিতে পারে। অতএব তাঁহারা যদি হারমোনিয়ামের "সি" সুরের খাদের "পঞ্চম"কে সুর করিয়া গানটিকে ধরেন, অর্থাৎ যদি হারমোনিয়ামের "জী" সুরে গান করেন, তবে, মনে হয়, যে তাঁহাদের পক্ষে, গলা অতটা চড়াইতে, কোনই কষ্ট বা অসুবিধা হইতে পারে না।

শ্রীমোহিনী সেন গুপ্তা।

আশ্রুজ্বী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণচতুর্দ্দশী, রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর, আকাশে একখানি কাল মেঘ জমাট বাঁধিয়া চতুর্দ্দশীর অন্ধকারকে আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া মধ্যে মধ্যে ঝিল্লীরব ও ভীত শৃগালের কণ্ঠধ্বনি শোনা যাইতেছে, সেই গভীর রাত্রে বন মধ্যে একাকিনী এক নারী দণ্ডায়মানা, তাহার সর্ব্বাঙ্গে বস্ত্রাচ্ছাদিত। ভীত-চকিত নেত্রে সে আশ্রয়াম্বেষণে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিল, সহসা বনভূমি আলোড়িত করিয়া ঝড় ও সঙ্গে সঙ্গে মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল। রমণী প্রকৃতির সহসা এই পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে না পারিয়াই যেন বৃক্ষতলে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল, তাহার বক্ষচ্যুত নবজাত শিশুর ক্রন্দন আর্ত্ত প্রকৃতির ক্রন্দন শব্দের সহিত মিলিত হইল। ক্রমে প্রকৃতি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা-প্রাপ্তা নারী শিশুকে বক্ষে চাপিয়া অশ্রুতরঙ্গে তাহার সিক্তদেহ আরো ভিজাইয়া তুলিল। আমরা এই রমণী ও তাহার শিশুকে এই গভীর অরণ্য মধ্যে তাহাদের অদৃষ্টের ক্রোড়ে রাখিয়াই এখনকার মত পাঠকদের নিকট বিদায় লইলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নর্ম্মদা তীরবর্ত্তী মহারাজ বিনোদ সিংহের রাজপ্রাসাদ অদ্য আনন্দে মুখরিত। রাজানন্দ মঙ্গলধ্বনি উত্থিত হইতেছে, সকলেরই মুখে

"জয় মহারাজের জয়, জয় বিনোদসিংহের জয়" শব্দ ঘোষিত হইতেছে।

পুত্রসম প্রজাপালক নিঃসন্তান মহারাজ বিনোদ সিংহের বৃদ্ধ বয়সে কন্যারত্ন লাভ হইয়াছে, আজ মহারাজ তাঁহার রাজভাণ্ডার খুলিয়া দিয়াছেন। যে যাহা চাহিতেছে রাজকুমারীর মঙ্গল কামনায় রাজা স্বয়ং মুক্তহস্তে তাহাকে তাহাই দিতেছেন।

দীন দরিদ্রগণ আশাতীত ধনপ্রাপ্তে হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে মহারাজের জয় ঘোষণা করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছিল। অদ্য রাজ্যমধ্যে শত্রু, মিত্র, বৃদ্ধ, যুবা, ধনী, দরিদ্র ভেদ নাই, সকলেই মহারাজের অপ্রত্যাশিত কন্যালাভে আনন্দে বিহ্বল!

মহারাজ বিনোদসিংহ পরম ধার্ম্মিক পুরুষ। তাঁহার অধিকাংশ সময় ভগবৎ চিন্তায় ও পূজার্চ্চনায় অতিবাহিত হইত। তিনি রাজা হইয়াও কখনও রাজোচিত বেশ পরিতেন না। তাঁহার ললাট সর্ব্বদা চন্দনে চর্চ্চিত, গলায় তুলসীর মালা, চরণে কাষ্ঠ পাদুকা, আর পরিধানে কৌষেয়বসন থাকিত। তিনি যখন দরবারে আসিতেন অমাত্যবর্গ ও প্রজাগণ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ ভূতভাবন ভবানীপতি মনে করিয়া অবনত শিরে প্রণাম করিত। মহারাজ বিনোদসিংহের শান্তিময় রাজ্য চির শান্তিতেই চলিতেছিল। সংসারে আসক্তি কম থাকায় রাজকার্য্য হইতে অনেকখানি অবসর লইয়া বিশ্বাসী মন্ত্রীর উপর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া রাজা নিজে পূজা অর্চ্চনায় অধিকাংশ কাল ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজা নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া কখনও দুঃখ প্রকাশ করিতেন না। মন্ত্রী কিংবা অন্য উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী কেহ তাঁহাকে বিস্তর যুক্তি দেখাইয়া দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিতে বলিলে, তিনি হাসিয়া প্রত্যুত্তরে বলিতেন "আমার পুত্রের অভাব কি, রাজ্য শুদ্ধ প্রজা আমার পুত্র।" কাজেই আর কেহ তাঁহাকে এবিষয়ে জেদ করিতে সাহস করিত না। এক্ষণে মহারাজের কন্যা হওয়ায় তাঁহার সকল অভাবই পূর্ণ হইল এবং তাহার হিতাকাঙ্ক্ষীদেরও আর দুঃখের কারণ রহিলনা।

কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবার পর দিবস মহারাজ দরবারগৃহে আসিয়াছেন ও গুটিকয়েক জটিল রাজকার্য্য সমাধা করিয়া প্রার্থিদের প্রার্থনা পূরণ করিতেছেন। কাহাকেও রাজকার্য্যে নিয়োগ, কাহাকেও উচ্চপদে উন্নীত, কাহারও বা বেতন বৃদ্ধি, এইরূপে বেলা প্রহরেক উত্তীর্ণ হইয়া গেল। দরবার ভঙ্গপ্রায়, মহারাজ গাত্রোত্থান করিবেন, এমন সময়ে পার্শ্বোপবিষ্ট মন্ত্রী বিনয় বচনে কহিলেন "মহারাজ! দাস কোন অপরাধে আপনার প্রদত্ত দানে বঞ্চিত রহিল!"

বিনোদসিংহ সহাস্যে বলিলেন "মন্ত্রি তুমিত আমার কাছে কিছুই প্রার্থনা কর নাই! আর তোমায় আমার অদেয় কিই বা আছে যদি নূতন কিছু থাকে বল আমি এখনই তাহা দিতে প্রস্তুত আছি।"

মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ! দাসের আশা উচ্চ, রাজপ্রাসাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন আমায় দান করুন।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "সে বস্তু কি ?"

মন্ত্রী মহারাজকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইল সে যাহা চাহিবে তাহাই দিতে হইবে।

রাজা কহিলেন "হাঁ আমি প্রতিশ্রুত

হইতেছি তুমি অসঙ্কোচে বলিতে পার।" মন্ত্রী কিছু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "রাজকুমারীকে আমার চন্দনসিংহকে অর্পণ করিবেন এই আমার প্রার্থনা।"

মহারাজ সহসা চমকিত হইলেন ও মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার বদন বিমর্ষ হইল। মন্ত্রী মহারাজের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তবে কি সত্যাশ্রয়ী মহারাজ অপত্য স্নেহে প্রতিজ্ঞা পালনে কাতর হইলেন?" ইহা শুনিয়া মহারাজ বিনোদ-সিংহের নয়নদ্বয় উজ্জ্বল ও বক্ষ স্ফীত হইল। মহারাজের ভাব দেখিয়া সভাশুদ্ধ লোক ভীত ও নীরব! সভাগৃহে সূচি পতনেরও শব্দ শোনা যায়।

মহারাজ দৃঢ়স্বরে বলিলেন "বিনোদসিংহ চিরদিন সত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছে সে আজ প্রতিশ্রুতি পালনে অক্ষম হইবেনা।" ক্ষণপরে অপেক্ষাকৃত নম্রস্বরে বলিলেন, "মন্ত্রী তোমার বাক্যের প্রত্যুত্তর দানে বিলম্ব হইবার কারণ—জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, মনুষ্য করায়ত্ত নহে; সেইজন্য ইতস্ততঃ করিতে-ছিলাম ভগবানের নাম লইয়া আমি অদ্যই চন্দনসিংহকে রাজকুমারী অর্পণ করিলাম। এক্ষণে উহাদের অদৃষ্ট!" এই বলিয়া রাজ-সভা ভঙ্গ করিয়া মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। স্তব্ধ সভা নির্ব্বাক বিস্ময়ে রাজার পানে চাহিয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তাহার পর সুদীর্ঘ দশ বৎসর অতীত হইয়াছে। রাজকন্যার নাম মাধুরী রাখা হইয়াছে। অন্তঃপুরস্থ প্রমোদ-সরোবরে মর্ম্মর-নির্ম্মিত সোপানপোবিষ্ট মাধুরী ভাস্কর-খোদিত প্রতিমার ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। আলুলায়িত কুন্তলরাশি পৃষ্ঠদেশে পড়িয়া কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যেরই সৃষ্টি করিতেছিল! ধরিত্রী-দেবীর ন্যায় স্থিরা বালিকা নিবিষ্ট মনে পুষ্করিণীর বৈকালিক শোভা দর্শনে মুগ্ধা! অদূরে ভ্রমণক্লান্ত মহারাজ সহধর্ম্মিণীসহ এক বেদীর উপরে উপবেশন করতঃ, মাধুরীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দেখ রাণি, মাধুরী দিন দিন কি অভিনব লাবণ্যে মণ্ডিতা হইতেছে?"

রাণী কহিলেন "মহারাজ, মাধুরী আপ-নার ধর্ম্মরাজ্যের অশুভনাশিণী রোহিণী নক্ষত্র। মহারাজের দেবপূজা সার্থক হইয়াছে, স্বয়ং লক্ষ্মী আজ কৃপাবশে বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া রাজপুরী আলোকিত করিয়াছেন। মাধুরী যখন কৌষেয় বস্ত্র পরিধান করিয়া কালিকা-মন্দিরে পূজা করে সকলে অনিমিষ লোচনে তাহাকে দেখিতে থাকে।"

রাজা বলিলেন, "চন্দন মাধুরীর অযোগ্য হইবেনা, ওই দেখ!" রাণী চাহিয়া দেখিলেন সপ্তদশবর্ষীয় যুবা চন্দনসিংহ ভ্রমণোপযোগী বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ধীর পদক্ষেপে মাধুরীর দিকে আসিতেছে। রাজা কহিলেন "চল, আমরাও মাধুরীর কাছে যাই।" তাঁহারা উভয়েই কন্যার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, চন্দনসিংহও আসিল। রাজা সস্নেহে ডাকিলেন "মাধুরী!" মাধুরী পিতৃকণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজা কহি-লেন, "কি দেখিতেছিলে মা?" মাধুরী কহিল "বাবা দেখ কেমন সুন্দর পদ্ম ফুটেছে! আমি একটা নেব।" রাজা কহিলেন, "সন্ধ্যার সময়

পদ্ম কে আন্‌বে মা, কাল সকালে আনাইয়া দিব।" মাধুরী আব্‌দার করিয়া কহিল, "কাল সকালে ভাল থাকবে না, আমি আজই নেব।" পিতাকে বিব্রত দেখিয়া মাধুরী বলিল "চন্দনকে বলনা বাবা, ও এখনই এনে দেবে।"

মহারাজ চন্দনকে মাধুরী অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইবার পর হইতেই চন্দন রাজ-প্রাসাদে স্থান পাইয়াছে, এবং চন্দন ও মাধুরী বাল্যকাল হইতে একসঙ্গে বাস করিতেছে বলিয়া চন্দনকে মাধুরী কোনরূপ লজ্জা বা সঙ্কোচ করে না।

রাজা হাসিয়া কহিলেন "দুর্ পাগ্‌লী! চন্দন কি এই সময়ে এত বড় পুকুর থেকে পদ্ম আনিতে পারে?"

মাধুরী কহিল "কেন পারবেনা? ভারী যে বীর বলে পরিচয় দেয়, তলোয়ার খেলে, পাখী মারে, ঘোড়ার উপর দাঁড়ায়, আবার সেদিন নর্ম্মদায় সাঁতার কাটছিল, আর এই পুকুর থেকে একটা পদ্ম আনিতে পারিবেনা? খুব পার্‌বে তুমি বলনা বাবা!"

চন্দন এতক্ষণ নীরব হইয়া শুনিতেছিল, এইবার বলিয়া উঠিল "তাই বলে কি মরতে হবে নাকি, এখন কেউ পারে না।"

মাধুরী চন্দনের অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "কেউ পার্‌বে না কেন, তুমি পার্‌বেনা তাই বল?"

রাজা ও রাণী উহাদের কলহে কৌতুকানু-ভব করিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ একটী বানবিদ্ধ পক্ষী রক্তাক্ত কলেবরে তাহাদের সম্মুখে পতিত হইল; সকলেই চমকিত হইয়া উঠিলেন। মাধুরী ছুটিয়া গিয়া পক্ষীটির পঞ্জর হইতে বানটী খুলিয়া লইয়া পুষ্করিণী হইতে কাপড় ভিজাইয়া জল আনিয়া পক্ষীটির মুখে সেচন করিতে লাগিল, কিন্তু হতভাগ্য পক্ষী এক ফোঁটা জল খাইয়াই চক্ষু দুটী মুদ্রিত করিল ও সঙ্গে সঙ্গে মাধুরীর হস্তে তাহার পক্ষী জীবনের অবসান হইল। মাধুরী পক্ষীকে গতায়ু বুঝিতে পারিয়া অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাহাকে ভূমিতে নামাইয়া রাখিয়া উদাস ভাবে তাহার মৃত দেহের প্রতি চাহিয়া রহিল। ইত্যবসরে এক সুন্দরকান্তি ভীল যুবা ধনুর্ব্বান হস্তে সেখানে উপস্থিত হইল, তাহাকে দেখিবামাত্র সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল!

মাধুরী উঠিয়া পরিচিতের ন্যায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি এই পাখী মেরেছ? তুমি বড় নির্দ্দয়, আহা দেখ দেখি পাখীটি কি যন্ত্রণাই না পেয়েছে!" এই বলিয়া মাধুরী কাঁদিয়া ফেলিল। ভীল বালক রাজকুমারীর অশ্রুপূর্ণ বদন দেখিয়া অতিশয় ব্যথিত হইয়া বলিল "আমায় ক্ষমা কর রাজকুমারী; আজ থেকে আমি আর পাখী মার্‌ব না। এই দেখ তোমার সাম্‌নে আমি ধনুর্ব্বাণ ফেলে দিলাম।" রাজকুমারী তখন সেই ষোড়শবর্ষীয় ভীল বালকের এই ত্যাগ স্বীকার দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল এবং তাহার মুখপানে তাকাইয়া রহিল। রাজা রাণী ও চন্দন সিংহ এতক্ষণ যেন মোহাবেশে ছিলেন: ভাবিতেছিলেন একি স্বপ্ন না ইন্দ্রজাল!

চন্দন সিংহ উপযাচক হইয়া বলিল "তোমার নাম কি? তুমি কি ভীল?" বালক কহিল "আমার নাম কানু!" রাজা এই সময় কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু চন্দন বলিল "আচ্ছা কানু, তুমি ত রাজকুমারীর এক

কথায় ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া দিলে এখন রাজকুমারীর জন্য একটী পদ্ম তুলিয়া আন দেখি।" ইহা শুনিয়া মাধুরী ভীত হইল ও কানুকে বলিল, "না কানু, তুমি যাইও না, আমার পদ্মের আর দরকার নাই।" চন্দন বলিল, "একটু আগে পদ্ম আনবার জন্য আমাকে বলছিলে আর এখন আনবার দরকার নাই কেন?" মাধুরী এই কথা শুনিয়া লজ্জিত হইল।

কানু কহিল "ভয় কি আমি এখনই পদ্ম আনিব। এই বলিয়া তাহার গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া সরসীবক্ষে ঝম্প প্রদান করিল এবং নিমিষে একটী পদ্ম আনিয়া মাধুরীর হস্তে দিল।

বিনোদ সিংহ সস্নেহে বলিলেন "ধন্য তোমার সাহস! এস, আজ তুমি আমার অতিথি; তোমায় উপযুক্ত পুরস্কার দিব।" তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, কৃতজ্ঞ নয়নে কানু বিনোদ সিংহের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "মহারাজ ক্ষমা করুন, আর একদিন আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিব। রাত্রি অধিক হইলে মা বড় ভাবিবেন" এই বলিয়া কানু অন্ধকারে মিশাইল। দেব মন্দিরে শঙ্খ ধ্বনি হইল, তখন সকলে কানুর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ব বর্ণিত ঘটনার পর এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কানুর কথা সকলে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু একটী ক্ষুদ্র বালিকা-হৃদয় তাহাকে ভুলিতে পারে নাই! সে বালিকা মাধুরী! এই বৎসর-ব্যাপী কাল মাধুরী সর্ব্বদাই কানুর কথা ভাবিত ও ক্রমে ক্রমে তাহার হৃদয় কানুর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। প্রাসাদশিরে ভ্রমণ কালে মাধুরীর চক্ষু ধীরভাবে জনস্রোতের ভিতর কি যেন অন্বেষণ করিত! উন্মুক্ত গবাক্ষে প্রায়ই মাধুরী নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, সর্ব্বদাই যেন কাহার অভাব অনুভব করিত কিন্তু তাহার নিরাশার দীর্ঘশ্বাস শুধু সমীরণে মিশাইয়া যাইত। চন্দন সিংহ মাধুরীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বিবিধ প্রকারে তাহাকে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু মাধুরী তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করিত ও চন্দন সিংহের নিকট হইতে দূরে থাকিবার প্রয়াস পাইত। চন্দন সিংহ এইরূপ পুনঃপুনঃ উপেক্ষিত হওয়াতে অসূয়াপরবশ হইয়া উঠিল এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল মাধুরীত তাহার পিতৃ-অঙ্গিকারে আমারই হইয়াছে, বিবাহের পর তাহার এ অহঙ্কার চূর্ণ করিব।

অদ্য রাজনগরী আনন্দে বিহ্বল। সকলেরেই বদনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব লক্ষিত হইতেছে। কল্য বরাহ চতুর্দ্দশী! বরাহ শিকারে ক্ষত্রিয়দিগের মহাপুণ্য! তাই সমগ্র নগরী আজ যেন নব জীবন লাভ করিয়াছে, যোদ্ধগণ নব উৎসাহে অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত করিতেছে। অদ্য কৃষ্ণ ত্রয়োদশী, সন্ধ্যাকালে রাজা সস্ত্রীক দেবী মন্দিরে পূজার্থে গমন করিতেছেন, মাধুরী ও স্বতন্ত্র শিবিকায় তাঁহাদের পশ্চাতে আসিতেছে। চন্দনসিংহ অগ্রেই বহুমূল্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া গমন করিয়াছে।

দেবী মন্দির বিজন অরণ্যে স্থাপিত। প্রতি বৎসর এই সময়ে এখানে মহামেলা হইয়া থাকে। অদ্য ও অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছে। অগণ্য উজ্জ্বলালোকে এই বনভূমি আলোকিত করাইয়াছে। আদূরে বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল সকলেই বুঝিল মহারাজ আসিতেছেন। সেই সমবেত জনস্রোত সমস্বরে "জয় মহারাজের জয়," বলিয়া সেই বনভূমি কম্পিত করিল। এই আনন্দোচ্ছাস শূন্যে না মিলাইতেই অকস্মাৎ সেই বিশাল জনস্রোত দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া যে দিক হইতে মহারাজ আসিতেছিলেন সেই দিকে ধাবিত হইল, অথচ ব্যাপার কি কেহই বুঝিতে পারিল না।

মহারাজের জয় ঘোষণার শব্দে মহারাজের একজন দেহরক্ষীর হস্তী হঠাৎ ক্ষেপিয়া উঠিয়া মাধুরীর শিবিকার দিকে ধাবিত হইল, বাহকগণ ভয়ে শিবিকা ফেলিয়া পলাইল, এবং সকলে 'গেল গেল মার মার' শব্দে হস্তীর পিছনে ছুটিল, কিন্তু সেই মত্ত হস্তীর গতিরোধ করিতে কেহই সক্ষম হইল না। মহারাজ এই দৃশ্যে অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং মাধুরীর জীবন রক্ষাকল্পে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "কে পার মাধুরীকে রক্ষা কর, আমার জীবন দান কর, তোমাদের রাজকুমারীকে রক্ষা কর।" চন্দনসিংহ ইতিপূর্ব্বেই অগ্রসর হইয়াছিল কিন্তু সেই মত্ত হস্তীর বেগ সামলাইতে না পারিয়া হটিয়া আসিল; মাধুরীকে রক্ষা করা অসম্ভব। হস্তী প্রায় শিবিকার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই বিশালকায় হস্তী মুহূর্ত্তমধ্যে শিবিকার সন্নিকটে ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল ও সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। রাজা ও রাণী মাধুরীর শিবিকা সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে মাধুরী অক্ষত শরীরে আছে কিন্তু ভয়ে তাহার বদনমণ্ডল পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাহারা মাধুরীকে শিবিকার ভিতর হইতে বাহির করাইয়া শুশ্রূষা করাইলেন এবং অল্পক্ষণ পরে মাধুরীর পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া আসিলে আবার আনন্দধ্বনির সহিত দেবীমন্দিরে আসিলেন এবং মাধুরীর জীবনদাতার অনুসন্ধানের আদেশ প্রদান করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই অভিনব যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত কানু রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিল ও মাধুরীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ক্ষমা কর মাধুরী, আজ দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ আমাকে আবার ধনুর্ব্বাণ লইতে হইয়াছে।"

কানুকে দেখিবামাত্র মাধুরীর গণ্ডদ্বয় লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল। বহুদিনের পর বাঞ্ছিতকে সম্মুখে পাইয়া তাহার নয়নে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল এবং তাহাকে তাহার রক্ষাকর্ত্তা জানিয়া কৃতজ্ঞতাভরে উদ্দেশে প্রণাম করিল।

মহারাজ বিনোদসিংহ কানুকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া পুনঃ পুনঃ শিরঃ-চুম্বন করিলেন এবং আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "এতদিন কোথায় ছিলে কানু? আজ তুমি মাধুরীর জীবন রক্ষা করিয়া আমাদের রক্ষা করিয়াছ; বয়সে বালক হইলেও তুমি যে কার্য্য করিয়াছ তাহাতে আজ হইতে আমাদের জীবন তোমার কাছে বিক্রীত রহিল।" এই বলিয়া রাজা অশ্রুপূর্ণলোচনে কানুর সেই সুন্দর

মুখকান্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কানুকে আজ ভীলবালকের পরিবর্ত্তে ক্ষত্রিয়োচিত বীর সাজে সজ্জিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমাকে এরূপ সাজে কে সজ্জিত করিয়াছে কানু ?"

কানু বলিল "মাতৃ আজ্ঞায় আজ এই বেশে সজ্জিত হইয়াছি। মাতৃ সমভিব্যাহারে দেবী অর্চ্চনায় আসিতেছিলাম পথিমধ্যে এই দুর্ঘটনা ! আজ যদি মাধুরীর নিকট আমার প্রতিজ্ঞামত ধনুর্ব্বাণ না লইয়া আসিতাম তাহা হইলে হয়ত—" বলিতে বলিতে কানুর কণ্ঠরোধ হইল। রাজা তাহাকে অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, ক্ষত্রিয় পূজায় তোমাদের অধিকার কি ?" কানু বলিল "মার মুখে শুনিয়াছি আমাদের বংশ-পরম্পরায় এই পূজা করিয়া থাকে।" রাজা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কানুর পিতামাতার পরিচয় লইতে যাইয়া দেখিলেন যে কানু অদৃশ্য হইয়াছে। তারপর যখন বিস্তর অনুসন্ধানেও তাহাকে পাওয়া গেল না তখন রাজা অতিশয় বিমর্ষ হইলেন এবং আপনার অজ্ঞাতসারে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "ধন্য বালক, ধন্য তোমার শিক্ষা, ধন্য তোমার বীরত্ব !"

চন্দনসিংহ কানুর উপর মহারাজের এতদূর আত্মীয়তা দেখিয়া মনে মনে বড়ই অশান্তি বোধ করিতেছিল এক্ষণে আবার মহারাজের মুখে তাহার প্রশংসা শুনিয়া আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বলিল "দূর হইতে হস্তীকে তীর-বিদ্ধ করায় এমন কি বীরত্ব হইয়াছে বুঝিলাম না ?" মাধুরী কানুর অদৃশ্য হইবার পর হইতেই ম্রিয়মান হইয়াছিল, তাহার উপর চন্দনসিংহের কথায় অতিশয় বিরক্ত হইল এবং পিতাকে তাহার প্রত্যুত্তর দিবার অবসর না দিয়া বলিল "বাবা আমার শরীর বড়ই অবসন্ন বোধ হইতেছে ; চলুন দেবী-মন্দিরে একটু বিশ্রাম করি।" রাজা তৎ-ক্ষণাৎ দেবী-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎকাল বিশ্রামলাভের পর পূজা সমা-পনান্তে সকলে প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অদ্য বরাহ চতুর্দ্দশী—রাত্রে বরাহ শিকার হইবে। সহরময় ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র সকলেই ব্যস্ত। বরাহ শীকারে যে ব্যক্তি অধিক বীরত্ব দেখাইতে পারিত সে রাজদরবারে উৎকৃষ্ট পুরস্কার লাভ করিত, তবে অজ্ঞাতকুলশীলকে এই শীকারে অনুমতি দেওয়া হইত না। যে নিজের পরিচয় সন্তোষভাবে বলিতে পারিত সে যে কোন জাতিই হউক না কেন, রাজার অনু-মতি লইয়া যোগদান করিতে পারিত। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রাজা দরবারে আসিয়াছেন ও প্রত্যেক ব্যক্তির পরিচয় লইয়া শিকারোপযোগী উপদেশ দিয়া বিদায় দিতেছেন। পার্শ্বোপবিষ্ট চন্দনসিংহকে অব-সর মত শিকার-কৌশল বুঝাইতেছেন। রাজা যদিও রাজকার্য্যে ভার আপাততঃ মন্ত্রীর উপর দিয়া উদাসীন থাকিতেন কিন্তু প্রতিবৎসর তাহার এইদিনে বড়ই অনুরাগ দেখা যাইত এবং সেই জন্যই তিনি আজ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। সহসা জনতা ভেদ করিয়া একটী বালক মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিল। মহারাজ

সেই বালককে দেখিয়া বলিলেন "এস কানু আমি তোমারই কথা ভাবিতেছিলাম, মনে করিতেছিলাম কই কানু ত অনুমতি লইতে আসিল না! তবে কি সে শিকারে অনিচ্ছুক!"

কানু কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্বরে উত্তর করিল, "মহারাজ আমার ঘোড়া নাই ভাল ঘোড়া পাইলে আমি শিকারে যাইতে পারি, আপনি আমাকে পুরস্কার দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন এক্ষণে আমায় একটী অশ্ব প্রদান করুন।"

রাজা তৎক্ষণাৎ চন্দন সিংহকে আদেশ করিলেন "কানুকে আমার প্রিয় অশ্ব ধবলকে দাও।"

চন্দনসিংহ শিহরিয়া উঠিল সে জানিত ধবল সাক্ষাৎ উচ্চৈঃশ্রবাঃ; রাজ্যমধ্যে এরূপ অশ্ব আর নাই। চন্দনকে এরূপ চিন্তিত দেখিয়া রাজা সহাস্যে বলিলেন "যাও চন্দন সিংহ ধবল অপাত্রে অর্পিত হইবে না।"

চন্দন সিংহের হৃদয়ে কানুর আবির্ভাব হইতেই দারুণ হিংসাবহ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছিল, এক্ষণে হঠাৎ তাহার এক বুদ্ধি যোগাইল—সে বিনীত বচনে মহারাজকে বলিল "শিকারের পদ্ধতি অনুসারে কানুর বংশ-পরিচয় অবগত হইয়া অশ্ব প্রদান করিলেই ভাল হয়।" রাজা বলিলেন, "তাহাই হউক কানু তোমার বংশ পরিচয় দাও।"

কানুর মুখ বিবর্ণ হইল সে তাহার পিতৃনাম অবগত নয়। মাকে বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াও জানিতে পারে নাই, এক্ষণে কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। চন্দন মনে মনে নিজ উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিল না।

মহারাজ কানুকে এইরূপ লজ্জিত ও ব্যথিত দেখিয়া বলিলেন, "কানু পদ্ধতি অনুসারে তোমার বংশ-পরিচয় অবগত না হইলে তোমাকে শিকারের জন্য অনুমতি দিতে পারি না। তুমি এক ঘণ্টার ভিতর তোমার বংশ-পরিচয় লইয়া আইস, অশ্ব প্রদান করিয়া তোমাকে শিকারের অনুমতি দিব; আমি তোমার নিমিত্ত আরও এক ঘণ্টাকাল দরবারে উপস্থিত থাকিব।"

কানু অবনত মস্তকে প্রস্থান করিল। চন্দন সিংহ মনে মনে হাসিল। রাজাও অবশিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজদরবারে এইরূপ লজ্জিত হইয়া দুর্ব্বিসহ গুরুভার হৃদয়ে ধারণ করিয়া কানু দ্রুতপদবিক্ষেপে দিক্‌বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া চলিতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই অরণ্য মধ্যে এক ভীল পল্লীতে প্রবেশ করিল এবং একখানি পর্ণকুটীরের দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিল "মা!" রুক্ষকেশা, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত এক প্রৌঢ়া নারী বাহির হইয়া কানুকে সম্মুখে দেখিয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন "কানু কি হইয়াছে বাপ! তোমার এত দেরী কেন, কোথায় গিয়াছিলে?"

মাতার প্রত্যুত্তর দানে অক্ষম কানু সহসা বাঁধভাঙ্গা বন্যারমত অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে মাতার পদতলে উপবেশন করিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া মাতা পুত্রের এতাদৃশ অবস্থায় ব্যথিত হইয়া মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুমি অভাগিনীর একমাত্র ভরসা, অন্ধের যষ্টি! তোমার কি

কেহ কিছু বলিয়াছে?" কানু মাতার স্নেহ-বাক্যে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া বলিল, "আজ বড়ই অপমানিত হইয়াছি, রাজদরবারে নিজের পরিচয় দিতে পারি নাই। তোমাকে কত-দিন জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাহার উত্তরে তুমি বল আমি মহাপুরুষের সন্তান। তবে পিতৃ-নামে আমার অধিকারনাই কেন? মহারাজা এক ঘণ্টা সময় দিয়েছেন ইহার মধ্যে তাঁহাকে আমার পরিচয় দিতে হইবে। এখনই আমার বংশ-পরিচয় দাও মা, নতুবা এ মুখ আর দেখাইব না, নর্ম্মদার শীতল জলে অন্তরজ্বালা নিভাইব।"

মাতা পুত্রের বাক্যে ব্যথিত হইয়া বলিলেন "স্থির হও বাছা এখনই তোমার পরিচয় বলিতেছি, তুমি রাজার নিকট বলিও—"কানু উদগ্রীব হইয়া মাতার দিকে চাহিয়া রহিল, মাতা বলিতে লাগিলেন "বৎস তোমার পিতামহ অজয় নগরের মহারাজ মহাতপসিংহ; তাঁহার দুইপুত্র, কনিষ্ঠের বংশধর তুমি। তোমার জ্যেষ্ঠতাত উচ্ছৃঙ্খল, বিলাসপ্রিয় ও পিতার অবাধ্য ছিলেন সেই জন্য তোমার পিতামহ তাঁহাকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া তোমার পিতাকে রাজ্য প্রদান করেন। ইহার দুই বৎসর পরে তোমার পিতামহের মৃত্যু হয়। এই সুযোগ পাইয়া তোমার জ্যেষ্ঠতাত রাজ্য মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া গোপনে তোমার পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন এবং এক দিন তাঁহাকে শিকারে লইয়া যান—"এই সময় রমণীর রুদ্ধ অশ্রু সবেগে বাহির হইল এবং কণ্ঠরোধ হইল। কানু ও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না, অশ্রু-পূর্ণ লোচনে বলিল, "তারপর বল মা, সময় অতিবাহিত হইতেছে লোকে বলিবে আমি পিতৃপরিচয় দিতে অক্ষম।" রমণী অঞ্চলে অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "সেই শিকারে যাওয়াই তাঁহার শেষ হইল আর ফিরিলেন না। তোমার জ্যেষ্ঠতাত ফিরিয়া আসিয়া প্রচার করিলেন যে তোমার পিতা ব্যাঘ্র-কবলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। কয়েকদিন পরেই তিনি সিংহা-সনে আরোহণ করিলেন, তুমি তখন এই অভাগিনীর গর্ভে। কয়েক মাস পরে যখন আমি আসন্ন-প্রসবা, শুনিতে পাইলাম তোমার জ্যেষ্ঠতাত আমার সন্তান সম্ভাবনা জানিয়া সেই সন্তানকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিতে-ছেন, তখন আমি ভয়ে অধীর হইলাম এবং জ্যেষ্ঠা রাণীর সাহায্যে একদিন গভীর নিশীথে রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া বিজন অরণ্যমধ্যে আশ্রয় লইলাম। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি মনে হইলে এখনও আমার হৃৎকম্প হয়! সেই রাত্রিতে ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগে, বিজন অরণ্যে, তোমার জন্ম হয়। তোমার মুখ দেখিয়া আমি সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া তোমাকে লইয়া এক মহাপ্রাণ ভীলের বাটীতে আশ্রয় লইলাম সে ভীলকে তুমি দেখিয়াছ, আহা সপ্তদশ বৎসর আমাদের আশ্রয় দিয়া সে বৃদ্ধ গত বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাঁরই যত্নে ও দয়ায় আজ তুমি অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবক।" রমণীর গণ্ড বহিয়া অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বলিলেন, "রাজার নিকট এই পরিচয় দিও আর এই পদকটি তাঁহাকে দেখাইও তাহা হইলে তোমার বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে তাঁহার কোনই সন্দেহ থাকিবে না" এই বলিয়া রমণী সযত্নে রক্ষিত স্বর্ণশৃঙ্খলে

বদ্ধ চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-নির্ম্মিত একটি কৌটা বক্ষদেশ হইতে বাহির করিয়া পুত্রের হাতে দিলেন। কানু সময় সংক্ষেপ জানিয়া মাতৃ-প্রদত্ত হার কণ্ঠে ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে রাজদরবারে ধাবিত হইল, মাতাও অবসন্ন-ভাবে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

নির্দ্দিষ্ট ঘণ্টা অতীত হইয়াছে জানিতে পারিয়াও রাজা কানুর জন্য ইচ্ছাপূর্ব্বক বিলম্ব করিতেছেন। চন্দনসিংহ পুনঃ পুনঃ জানাইতেছে মহারাজ কানুর আসিবার সময় হইয়া গিয়াছে সে নিশ্চয়ই তাহার পরিচয় জানিতে পারিবে না, এরূপ অজ্ঞাতকুল-শীলকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। রাজা এই সমস্ত শুনিয়া একটু বিমর্ষ হইলেন আর অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন ভাবিয়া গাত্রোত্থান করিবেন এমন সময়ে পথপর্য্যটনক্লান্ত কানু গলদ্ঘর্ম্ম অবস্থায় আসিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া পুলকিত হইলেন। কানুর উপস্থিতিতে চন্দনসিংহের মুখমণ্ডল সহসা ম্লান হইয়া গেল, অতিকষ্টে আত্মসংযম করিয়া বসিয়া রহিল।

রাজা সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি সংবাদ কানু?" কানু রাজ আজ্ঞা পাইয়া সেই মাতৃপ্রদত্ত স্বর্ণশৃঙ্খলবদ্ধ কৌটাটি রাজাকে দিল ও মায়ের মুখে যাহা শুনিয়াছে তাহা যথাযত বিবৃত করিল। রাজা কানুর মুখে ও কৌটার ভিতর কানুর পরিচয় পাইয়া পুলকিত চিত্তে কানুর হস্ত ধারণ করিয়া নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন এবং উচ্চকণ্ঠে চন্দনসিংহকে ও উপস্থিত সভাসদ্‌বর্গকে বলিলেন, "এই কানু সামান্য বালক নয়! এতদিন যাহাকে আমরা অজ্ঞাতকুলশীল বলিতেছিলাম, সেই কানু মহাপ্রতাপশালী মহাতপসিংহের পৌত্র ও মহিমসিংহের পুত্র। এই উহার পিতার প্রতিকৃতি, কি চমৎকার সাদৃশ্য! কেবল বয়সের তারতম্যে যেটুকু প্রভেদ যায়!"

চন্দনসিংহের অন্তরে তখন মহাপ্রলয় বাঁধিয়াছে, সে নির্ব্বাক নিশ্চল হইয়া রহিল।

রাজা সেই কৌটাটী লইয়া এবং কানুর হস্ত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। মাধুরী মাতার নিকট বসিয়া ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করিতেছিল, হঠাৎ পিতার সহিত কানুকে উপস্থিত দেখিয়া পাঠ বন্ধ করিল এবং সেখান হইতে উঠিয়া যাইবার চেষ্টা করিলে রাজা বলিলেন, "বস মা মাধু, কানুকে লজ্জা করিতে হইবেনা। আজ কানুর পরিচয় পাইয়াছি এই দেখ, বলিয়া সেই কৌটাটী রাণীর হস্তে দিলেন ও মাধুরীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন কানুকে আমরা অজ্ঞাতকুলশীল ভীল বালক বলিয়া জানিতাম, কিন্তু আজ তাহার সেই ভীল আবরণ ভেদ করিয়া রাজপুত্রের পুণ্য-জ্যোতি প্রকাশ হইয়াছে। কানু পরলোকগত মহারাজ মহিমসিংহের পুত্র।"

রাণী এতক্ষণ অতি মনোযোগ সহকারে সেই কৌটাস্থিত কানুর বংশ-পরিচয় পাঠ করিতেছিলেন ও তাহার পিতার প্রতিকৃতির সহিত তাহার প্রতি অবয়বের সাদৃশ্য দেখিয়া মোহিত হইতেছিলেন; এক্ষণে বলিয়া উঠিলেন "আশ্চর্য্য বটে!"

মাধুরীর তখন কোথা হইতে বিষম লজ্জা

আসিয়া উপস্থিত হইল সে আর কাহুর দিকে চাহিতে পারিল না ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

কিয়ৎক্ষণ বাক্যালাপের পর রাজা কাহুকে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিতে বলিলেন এবং তাহাকে 'কানন' বলিয়া সম্বোধন করিলেন, (এখন হইতে আমরাও তাহাকে কানন বলিব।) কিন্তু মাতা উৎকণ্ঠিত জানিয়া কানন বিদায় প্রার্থনা করিল; অগত্যা মহারাজ তাহাকে তাঁহার 'ধবল' প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন। বিদায় কালে কাননের চঞ্চল দৃষ্টি যেন কাহার অনুসন্ধান করিতেছিল। রাজপথে যাইয়া সে অশ্বারোহণ করিল এবং প্রাসাদের গবাক্ষগুলির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিল, এবার তাহার বাসনা পূর্ণ হইল; দেখিল গবাক্ষ মধ্যে একখানি সুন্দর আনন, কমলের ন্যায় ভাসিতেছে। চারিচক্ষুর মিলন হইল। তৎক্ষণাৎ গবাক্ষস্থ নয়ন দুটী লজ্জায় নমিত হইল কানন ও মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইল।

কানন চলিয়া যাইলে কিশোরী একটী সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল ও অস্ফুটস্বরে কি বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ পশ্চাতে চন্দন-সিংহ বলিয়া উঠিল "রাজকুমারী! তন্ময় হইয়া কি দেখিতেছিলে?" মাধুরী কোন উত্তর করিল না। চন্দন পুনরায় কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল "তোমায় বলিতেই হইবে কি দেখিতেছিলে?"

ক্রমশঃ।

"প্রাণের সেতার।"

(রাগিনী খট্)

চিরদিনের বাঁধা সুরে
প্রাণের সেতার মেলা
আকাশ আলো হাওয়ায় যে সুর
সেই সুরে প্রাণ মেলা!
খুলে দে'রে মনের বাঁধন
থামারে তোর প্রাণের কাঁদন
বিশ্বসাথে প্রেমের সাধন
কর্‌রে সকল বেলা!

সহজ হয়ে ফুলের সাথে
ডাক্ দে'রে তুই তা'রে
এই কল—মুখর তরুর সনে
আনন্দ গান গা'রে!
সহজ হয়ে পাখীর গানে
তটিনীর চির কলতানে
সোচ্ছল তারার গভীর গানে
প্রাণের সেতার মেলা॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল।

শিল্প।

সহজকাটের মেয়েদের "ব্লাউস্।"

চৌদ্দ বৎসর হইতে আঠার বৎসরের মেয়ের গায়ের "ব্লাউস" তৈয়ার করিতে হইলে কতটা কাপড়ের প্রয়োজন, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম।

কাপড়ের মাপ।

৪০ ইঞ্চি বহরের কাপড়, চৌদ্দবৎসরের একটী মেয়ের গায়ের "ব্লাউসের" জন্ম ১½ গজ লাগিবে। যোল বৎসর হইতে আঠার বৎসরের মেয়ের জন্ম ১¾ গজ কাপড় লাগিবে।



ব্লাউস্ কাটিবার প্রণালী।

ব্লাউসের কাটের যে চিত্রটি দেওয়া হইয়াছে এখন তাহা দেখুন্। ৪০ ইঞ্চি বহরের একখণ্ড কাপড় দুই পাট করিয়া লওয়া হইয়াছে। গজের ফিতার দ্বারা মাপ লইয়া চিত্রানুযায়ী আকারে কাপড়ের উপর দাগ দিয়া ব্লাউসের গলা, বুক, পিঠ ও হাতা একেবারে কাটা হইয়াছে; তৎপরে হাতের কপুটি আলাদা কাটা হইয়াছে।

গায়ের মাপ লইবার প্রণালী।

এখানে একটী হৃষ্টপুষ্ট চৌদ্দ বৎসরের বালিকার গায়ের মাপ দিলাম।

বুকের কাপড়ের ঝুল—১৮ইঞ্চি
পিঠের " "—১৭½ "
বুকের চওড়া—২২ ইঃ (১১ ইঃ করিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ২২ ইঃ)
গলার ঘের—১৩½ ইঃ (সম্মুখে ৭½, পশ্চাতে ৬ ইঃ, সর্ব্বশুদ্ধ ১৩½ ইঃ)
হাতের লম্বা—২৫ ইঃ (বুকের মাঝখান হইতে হাত পর্য্যন্ত)
হাতের কপের চওড়া—২ ইঃ

কাপড়খানি দুইভাজ করিয়া লওয়ার জন্ম একেবারে দুইটী হাত, দুই পার্শ্বের পিঠ ও বুক কাটা হইয়া যাইল, এখন কাটা কাপড়টী খুলিয়া যে ভাবে পাট আছে সেই ভাবে পাট না করিয়া হাতের লম্বার দিকে, মাঝামাঝি পাট করিয়া লউন। তৈয়ারী



"ব্লাউসের" যে চিত্রটী দেওয়া হইয়াছে এখন তাহা দেখুন। তৈয়ারী ব্লাউসের ন্যায় ঐ ভাবে কাটা কাপড়টী সেলাই করিয়া হাতে ও গলায় ইচ্ছামত সরু লেস্ দিয়া ও কোমরে (Elastic) এলাসটিক বা ফিতা পরাইয়া শেষ করিতে পারেন। পিঠের দিকে বোতাম বসিবে।

এইরূপ ব্লাউস ১০ বৎসরের বালিকা হইতে প্রবীণাগণ পর্য্যন্ত পরিতে পারেন। এখন এই প্রণালী অনুসারে যে কোনও স্ত্রীলোকের গায়ের "ব্লাউস্" কাটিয়া সেলাই করিলেই সুন্দর এক একটী "ব্লাউস্" তৈয়ার হইয়া যাইবে।

উপাসনা।

নিশান্তে দিনান্তে শুধু নহে ভগবান!
আমি চাহি প্রতিক্ষণে মোর সারা প্রাণ
তোমারি চরণ-প্রান্তে একান্তে বসিয়া
পীযুষ-সাগর মাঝে অহহ ডুবিয়া
নিরখি' তোমার ওই করুণা-কোমল
প্রশান্ত আনন পানে! হৃদি-শতদল
ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে মধু-গন্ধ-রূপে
তোমারি মাধুরী শুধু প্রতি মর্ম্ম-কূপে
অতর্কিতে লভি নাথ, তোমারি ধরায়
আনন্দে গৌরবে কিবা অর্চ্চিতে তোমায়
উঠিবেগো বিকশিয়া! প্রতিক্ষণ মম
এমনি করিয়া নিত্য সত্য-প্রিয়তম!
পূর্ণ হবে ধন্য হবে তোমারি সবায়
জন্ম-জন্মান্তর লাগি' তুলি' আপনায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

সামায়িক প্রসঙ্গ।

নারী বিচারক—ইংলণ্ডে নারীগণ ব্যারিষ্টার বা বিচারক হইতে পারিতেন না, যুদ্ধের ফলে সম্প্রতি এই নিয়মের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব ভারত—সচিব লর্ড ক্রুর পত্নী, প্রধান মন্ত্রী লয়েডজর্জ্জের পত্নী, লেডী লণ্ডন ডেরি, লর্ডহেলডেনের ভগিনী কুমারী এলিজাবেথ হেলডেন, কুমারী গারট্রুড, উপন্যাস লেখিকা শ্রীমতী হোমফ্রি ওয়ার্ড ও শ্রীমতী নিউনি ওয়েরব প্রভৃতি নারীগণ এক্ষণে ইংলণ্ডের বিচারকের পদে নিযুক্তা হইয়াছেন।

নূতনযুগে ভারতনারী কি করিবেন?—গত ডিসেম্বর মাসে ভারত সম্রাট তাঁহার উদার ঘোষণাবাণী প্রচার করিয়াছেন, যে "ভারতবর্ষে নূতন যুগের প্রবর্ত্তন হইবে।" এই নূতন যুগে ভারতের ভবিষ্যৎ গৌরব প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এই দেশের নারী সমাজ কিরূপ ভাবে চেষ্টা করিবেন এক্ষণে এই চিন্তা নারী-হিতকাঙ্ক্ষী মহোদয় ও মহোদয়াগণের মনে উদয় হইয়াছে।

গোখলে মেমোরিয়েল বালিকা বিদ্যালয়—ডাক্তার পি, কে, রায়ের পত্নী শ্রীমতী সরলা রায়ের চেষ্টায় ভবানীপুরে "গোখলে মেমোরিয়েল বালিকা বিদ্যালয়" নামে এক বালিকা বিদ্যালয় ১লা মার্চ্চ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। বালিকাদিগকে সুপ্রণালীতে, উন্নত শিক্ষা দান করাই ঐ বিদ্যালয়ের লক্ষ্য হইবে।

ভাবী গবর্ণরজেনারেল—এইরূপ জনরব যে, লর্ড সেলবরণ ভারতের গবর্ণর জেনারেল হইবেন। লর্ড সেলবরণ ভারত সংস্কার আইন প্রণয়নে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

সার জগদীশচন্দ্র বসুর নূতন উপাধি—ভারত-গৌরব সার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সম্প্রতি এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তার উপাধি প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

বেড়াইবার জমি—কলিকাত

গঙ্গার ধারে ষ্ট্র্যাণ্ডরোডের পার্শ্বে সাধারণের বেড়াইবার জন্ত কতকটা জমি লওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। এই ব্যবস্থা কর্ত্তব্য কিনা, তাহা সিদ্ধান্ত করিবার জন্ত এক কমিটি বসিবে। এই কমিটিতে থাকিবেন পোর্ট কমিশনারদের প্রতিনিধি, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রষ্টের প্রতিনিধি ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটির প্রতিনিধি।

প্রিভি কাউন্সিল আপীলের নূতন নিয়ম—ভারতের হাইকোর্ট সমূহ হইতে বিলাতে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করিবার সম্বন্ধে নূতন নিয়ম জারি হইয়াছে। হাইকোর্টের যে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল হইবে, সেই রায় বাহির হইবার পর নব্বই দিনের মধ্যে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল দায়ের হওয়া চাই। এই নিয়ম ১৯২১ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে কার্য্যে আসিবে।

মিশরে ক্লেমেশোঁ।—ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী এম, ক্লেমেশোঁ ভ্রমণে বাহির হইয়া মিশরে পৌঁছিয়াছেন।

টেলিগ্রামের মাশুল হ্রাস—টাকা পাউণ্ডের বিনিময় হার পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া, ভারত গবর্মেণ্ট বিলাতী টেলিগ্রামের ও মাশুল কমাইয়া দিয়াছেন। ইউরোপে টেলিগ্রাম করিতে হইলে এক্ষণে প্রতি কথায় এক টাকা চারি আনা হিসাবে মাশুল দিতে হয়; ১লা মার্চ্চ হইতে প্রতি কথা একটাকা হিসাবেই দিলেই চলিবে।

পুনায় বাধ্যতামূলক বালিকা শিক্ষা—পুনার মিউনিসিপাল আফিসে বোম্বাই পুনার বালক ও বালিকাদিগের শিক্ষা-ব্যবস্থার বিচার আলোচনা তুমুলরূপে চলিতেছে। পুনার মিউনিসিপাল কাউন্সিলরগণ বালক-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে চাহেন, কিন্তু বালিকা-শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার অনুরাগী নহেন। ইহার প্রতিকার প্রার্থনার জন্ত পুনায় প্রায় দুইহাজার রমণী ধ্বজা পতাকাদি লইয়া মিছিল বাঁধিয়া মিউনিসিপ্যাল আফিসে গিয়াছিল।

———

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতেপ্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 680. April, 1920.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫৭ বর্ষ। ৬৮০ সংখ্যা।	চৈত্র, ১৩২৬। এপ্রেল, ১৯২০।	১১শ কল্প। ৪র্থ ভাগ।

এই কি জীবন?

এই কি জীবন?—
এত সাধ এত আশা, প্রাণভরা ভালবাসা,
নিত্য মনুষ্যত্ব তরে এত আয়োজন;
জীবিতের যাহা শুভ, যাহা সত্য যাহা ধ্রুব,
তা'ও দিয়ে করণীয় আত্ম বিসর্জ্জন!
তবু লোকে বলে স্বার্থ, তবু খ্যাতি—"অপদার্থ",
সংসার এমন তর কে জানে কেমন!
এতখানি ব্যর্থতায়, কভু না কি সহা যায়,
এ হেন জীবন বহি কোন্ প্রয়োজন!
কেন বাড়ী কেন ঘর, কেন মিথ্যা আত্ম-পর,
কেন হাসি, কেন অশ্রু বিচ্ছেদ-মিলন?
আমি বলি মন খুলে, সকলেই যাও ভুলে,
খুলে দাও মহাপাশ মমতা-বন্ধন,
এই শেষ দীর্ঘশ্বাস দুর্ব্বহ জীবন।

শ্রী—মা।

মাধুরী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মাধুরী। আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই দেখিতেছিলাম; আমি তোমায় কোন কৈফিয়ৎ দিতে চাহি না; তুমি যাও, আমার শরীর অসুস্থ।

চন্দন ব্যঙ্গস্বরে বলিল, "আমি তোমার কাছে আসিলেই তোমার শরীর অসুস্থ হয়, কিন্তু অসভ্য জীর্ণ কাঙ্গুকে দেখিবার জন্য, গবাক্ষে আসিয়া অপেক্ষা করাতে, বোধ হয়, ক্লেশ হয় না। মাধুরি, তোমার অন্তঃকরণ যে এত নীচগামী তাহা জানিতাম না।"

মাধুরী এইবার দলিতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল এবং চন্দনসিংহকে ভর্ৎসনা

করিয়া বলিল, "দেখ চন্দন, তুমি যদি আমাকে এইরূপভাবে জ্বালাতন কর, আমি পিতাকে বলিয়া দিব। হাঁ, আমি কাহুকে দেখিতে ছিলাম, তুমি তাঁহাকে অসভ্য ভীল বলিলে তাহার কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে না; আজ সমস্ত রাজপুরী জানিয়াছে যে, সে রাজা মহিম-সিংহের পুত্র। প্রথম দর্শনাবধি আমি তাহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছি; আজও আমি তাহাকে সেইভাবেই দর্শন করিতেছিলাম। তুমি আর কখনও আমার সম্মুখে তাহার নিন্দা করিও না।" এই বলিয়া মাধুরী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সবে মাত্র উষার আলোক দেখা দিয়াছে; অরুণদেব পূর্ব্বদিক্ এখনও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করেন্ নাই; এরূপ সময়ে মাধুরী একটী মাত্র পরিচারিকার সহিত পূর্ব্ব-বর্ণিত কালিকা-মন্দিরে পূজার্থে আগমন করিয়াছে। কল্য রাত্রিতে বরাহশিকার করিতে যাঁহারা গমন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই মঙ্গল-কামনা মাধুরীর পূজার উদ্দেশ্য। মন্দিরের পুরোহিত এখনও আসেন্ নাই দেখিয়া মাধুরী মন্দির-সংলগ্ন সরসীর সোপানে বসিয়া স্বভাবের প্রাভাতিক-শোভা দর্শন করিতেছে। ক্ষণ-পরেই পুরোহিত আসিলে, মাধুরী মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভক্তিভরে কালিকাদেবীর পদতলে রাশি রাশি জবাপুষ্প ও সচন্দন বিল্বপত্র প্রদান করিয়া সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছিল; সহসা তাহার অন্তরে কাননের মূর্ত্তি জাগিয়া উঠিল। তাহার পর সে চন্দন-সিংহের মঙ্গল-প্রার্থনা করিল ও চন্দনকে পূর্ব্বদিন তিরস্কার করার জন্য সে মনে মনে লজ্জিত হইল।

অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে পূজা শেষ করিয়া বাহির হইবামাত্র মাধুরী দেখিল, অঙ্গন-মধ্যে একটী প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক মন্দিরের সম্মুখীন হইয়া ধ্যানমগ্না রহিয়াছেন্। রমণীর সদ্যঃস্নাত কেশরাশি ভূমিস্পর্শ করিতেছে, মনুষ্য-সমাগম নাই বলিয়া রমণীর মস্তকে সামান্য একটুখানিমাত্র বস্ত্র দেওয়া। রমণীর বেশ দেখিলে দরিদ্রা বলিয়া অনুমান হয়, কিন্তু সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে রাজরাণী বলিয়া ভ্রম হয়। রমণীর যৌবন শ্রী এখনও অন্তর্হিত হয় নাই। মাধুরী তাঁহাকে দেখিয়া চলচ্ছক্তি-রহিত হইল এবং মনে মনে ভাবিল, 'আমি ত এতদিন এই; মন্দিরে আসিতেছি, কখনও ত ইহাকে দেখি নাই যাহা হউক অপেক্ষা করি; ধ্যানভঙ্গ হইলে পরিচয় লইব।' ইহা স্থির করিয়া মাধুরী সেইস্থানে কতকগুলি পুষ্প লইয়া মাল্যরচনায় প্রবৃত্ত হইল। রমণীর ধ্যানভঙ্গ হইলে তিনি মাধুরীকে দেখিলেন, এবং মাধুরীও তাঁহার দিকে চাহিল। রমণী বীণাবিনিন্দিত স্বরে মাধুরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে মা তুমি এরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য লইয়া বনদেবীর ন্যায় মন্দির আলোকিত করিয়া রহিয়াছ?" মাধুরী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া বলিল, "মা, আমি মহারাজ বিনোদ সিংহের কন্যা! কল্য রাত্রিতে পিতা ও অন্যান্য অনেকেই বরাহ-শিকারে গিয়াছেন; তাঁহাদের মঙ্গল কামনায় মায়ের পূজা দিতে আসিয়াছিলাম।—আপনি কে মা? আপনাকে ত কখন এখানে দেখি নাই।" রমণী সস্নেহে মাধুরীর হস্ত ধারণ করিয়া চুম্বন

করিলেন এবং বলিলেন, "না মা, আমি প্রায়ই আসি না। দুই তিন বার মাত্র দেবীদর্শনের জন্য এখানে আসিয়াছি।" মাধুরী বলিল, "যখন দর্শন দিয়াছেন্ তখন আমাদিগের প্রাসাদে পদধূলি-দানে কৃতার্থ করুন্। মা আপনাকে দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইবেন। এখনই সকলে বরাহ শীকার করিয়া ফিরিবেন, আপনি দয়া করিয়া আসুন, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন।" রমণী কহিলেন, "না মা, আজ নয়, তোমার বিবাহের সময় আশীর্ব্বাদ করিতে যাইব, প্রতিশ্রুত হইলাম।" মাধুরী কহিল, "মা আপনি কে? আপনার পরিচয় পাইলে অত্যন্ত সুখী হইব।" তখন রমণী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "সামান্য ক্ষত্রিয়া মাত্র। আসি মা তবে!" এই বলিয়া ধীরপদবিক্ষেপে প্রাঙ্গণ পার হইয়া গেলেন। মাধুরীও এই অলোকসামান্যা রমণীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে পরিচারিকার সহিত প্রাসাদে ফিরিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরেই অদূরে বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইল; দেখিতে দেখিতে বিপুল জনস্রোত মহোল্লাসে রাজপথ মথিত করিয়া প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল; সঙ্গে সঙ্গে 'জয় কানন সিংহের জয়'-বাক্য উচ্চারিত হইল। রাজপথ-পার্শ্বস্থ অট্টালিকাসমূহ হইতে শঙ্খধ্বনি উত্থিত হইল এবং বিবিধ পুষ্প ও মাল্য বর্ষিত হইতে লাগিল। মাধুরীর হৃদয়ও আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল;—সে গবাক্ষ হইতে দেখিল অশ্বের উপর আরোহণ করায় কাননকে বাসবের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। তাহার পার্শ্বে স্বয়ং মহারাজ ও পশ্চাতে চন্দন সিংহ। চন্দনের মুখজ্যোতি ম্লান ও নয়নে ঈর্ষ্যাবহ্নি প্রজ্জ্বলিত। গবাক্ষের নিকট আসিবামাত্র মাধুরী একটী স্বহস্ত-রচিত সুন্দর পুষ্পমাল্য এরূপভাবে নিক্ষেপ করিল যে তাহা কাননের কণ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া শোভিত হইতে লাগিল। বঙ্কিমনয়নে কানন দেখিল তাহার আরাধ্য প্রতিমা গবাক্ষ হইতে সরিয়া যাইল। ক্রোধে চন্দনসিংহ অধরোষ্ঠ দংশন করিল। তৎপরে সকলে পুর-প্রবেশ করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ অবসাদ দূর করিবার পর সকলে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন।

রাজা ও কানন সিংহ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। চন্দন সিংহ ইতোমধ্যেই সকলের অলক্ষ্যে ক্ষিপ্রপদে মাধুরীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, মাধুরী কক্ষতলে শয়ানা রহিয়াছে। হঠাৎ চন্দন সিংহকে কক্ষমধ্যে দেখিয়া মাধুরী উঠিয়া বসিল এবং বলিল, "তুমি এরূপ সময়ে কেন আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করিতে আসিলে?"

চন্দন বলিল, "তোমার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে।"

মাধুরী কহিল, "কি?"

চন্দন কহিল, "কাননের গলায় কে মালা দিল?"

মাধুরী জ্র ঔষৎ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "আমি দিয়াছি। তুমি কি তাহার জন্য আমাকে তিরস্কার করিতে আসিয়াছ? অদ্য মায়ের পূজা দিতে গিয়া মন্দিরে এই মাল্য রচনা করিয়াছিলাম এবং শিকারে যে ব্যক্তি জয়লাভ করিবে, তাহার গলায় দিবার জন্য মনঃস্থ করিয়াছিলাম্। কাননের জয়ধ্বনি শুনিলাম; সেই জন্য তাহারই গলায়

মাল্য দিয়াছি; ইহাতে তোমার ক্রোধের কোন কারণ ত দেখি না।"

চন্দন কহিল, "দেখ মাধুরি তুমি জান যে মহারাজ আমার সহিত তোমার বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত। আমিও জানি যে, তুমি আমারই। কিন্তু কান্থর আবির্ভাবের পর হইতেই দেখিতেছি যে তাহার প্রতি তুমি বিশেষভাবে অনুরাগিণী হইয়াছ। এবং আমিও যেন সেই হইতে তোমার চক্ষুঃশূল হইয়াছি। কিন্তু ইহা স্থির জানিও, মাধুরি, আমি তোমাকে বিবাহ করিবই করিব। কান্থর কথা ভুলিয়া যাও।—আমি অদ্যই তোমার পিতাকে তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিব এবং যাহাতে তুমি অচিরাৎ আমার গৃহলক্ষ্মী হও, তাহার ব্যবস্থা করিব।"

মাধুরী নীরবে চন্দনের কথা শুনিতেছিল, কিন্তু এক্ষণে আর ধৈর্য্য-সংবরণ করিতে না পারিয়া রোষরক্ত-বদনে বলিয়া উঠিল, "কিসের ভ্রূকুটি দেখাইতেছ চন্দন? পিতাকে প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া তুমি আমাকে বিবাহ করিবে! সে কল্পনাকেও স্মৃতিতে স্থান দিও না। তাহা কখনই হইবে না। তোমার ন্যায় দাম্ভিক চরিত্রহীন কাপুরুষকে বিবাহ করার অপেক্ষা মৃত্যু সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। তুমি কি মনে করিয়াছ যে, মহাদেব সিংহের কন্যা মালতীকে প্রলোভনে করায়ত্ত করিয়াছ বলিয়া সকলকেই প্রলুব্ধ করিতে পারিবে? ধিক্ ধিক্ যাও, আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, আমাকে ভয় দেখাইতে বৃথা চেষ্টা করিও না। তোমার যাহা সাধ্য, তাহা করিও। মনে করিয়াছ, আমার পাণি গ্রহণ করিয়া রাজ্যলাভ করিবে ও মালতীকে রাজরাণী করিয়া আমাকে তোমার বিলাসের সামগ্রী করিয়া রাখিবে? তাহা মনেও স্থান দিও না। মনে করিও না যে মালতী-ঘটিত ব্যাপার আমি কিছুই জানি না।"

মনের উত্তেজনায় মাধুরী কাঁদিয়া ফেলিল; পরে বলিল, "চন্দন, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া তোমাকে তিরস্কার করিয়াছি; মনে কিছু করিও না। বাল্যাবধি আমরা একত্রে পালিত হইয়াছি; আমাদের যে সদ্ভাব হইয়াছে, আশা করি, তাহা ভ্রাতা-ভগিনীর মতন বুঝিতে চেষ্টা করিবে। আমার হৃদয় এখন অপরে সমর্পিত। কানন সিংহ ভিন্ন সেখানে আর কাহারও স্থান নাই।" এই বলিয়া মাধুরী ত্বরিত পদে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

চন্দনসিংহ কিয়ৎক্ষণ বিমূঢ় ও স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল; পরে 'আজই ইহার বিহিত করিতে হইবে' বলিয়া রাজ-সমীপে প্রস্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

বহুক্ষণ সদালাপের পর কানন সিংহকে বিদায় দিয়া মহারাজ বিনোদসিংহ বিশ্রামাগারে পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়া মনে মনে গত শিকারের বিষয় আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে চন্দনসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইল। চন্দনের হঠাৎ আগমনে মহারাজ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ, চন্দন?"

চন্দন অবনতমস্তকে বলিল "আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি। আমি এখনই এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিব।"

রাজা চমকিত হইয়া উঠিয়া বসিলেন এবং চন্দনকে নিকটে বসাইয়া সস্নেহে বলিলেন, "কি বলিতেছ, চন্দন? বিদায় লইতে আসিয়াছ কি! স্পষ্ট করিয়া বল, কি হইয়াছে? ব্যাপার ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না?"

চন্দন তখন মহারাজ-সমীপে অল্পক্ষণ-পূর্ব্বে মাধুরীর সহিত তাহার যে সমস্ত বাক্যালাপ হইয়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিল; এবং কিছু অতিরঞ্জিত করিতেও ক্রটী করিল না। কারণ, মহারাজ তৎক্ষণাৎ পালঙ্ক হইতে নামিয়া চন্দনকে বলিলেন, "আইস আমার সঙ্গে!"

চন্দন বুঝিল, ফল হইয়াছে। নীরবে সে মহারাজের অনুগামী হইল।

রাজা মাধুরীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "মাধুরি!" মাধুরী পিতার সহিত চন্দনসিংহকে দেখিয়া সমস্তই বুঝিতে পারিয়া মৌনাবলম্বনে রহিল। রাজা অধিক উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "মাধুরি, চন্দন আমার নিকট যাহা বলিয়াছে, তাহা কি সত্য?" চন্দনসিংহ কি বলিয়াছে, তাহা মাধুরী জানে না; কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল।

মাধুরীকে নীরব দেখিয়া, রাজা ক্রোধবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া মাধুরীকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তুমি জান যে, আমি তোমাকে চন্দনের হস্তে অর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আমার এ প্রতিজ্ঞাবন্ধন শিথিল হইবার নহে। তুমি কি ভাবিয়াছ, আমি কন্যাস্নেহে সত্যপালন হইতে বিরত হইব? শুনিলাম, তুমি না-কি কাঙ্গুর পক্ষপাতিনী? বেশ, আজ হইতে আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না। 'আমার রাজ্যে আজ হইতে কাঙ্গুর প্রবেশ নিষেধ' এই আদেশ এখনই প্রচার করিতেছি।" তৎপরে তিনি চন্দনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কেমন চন্দন, সন্তুষ্ট হইয়াছ ত? আমারই অমনোযোগিতায় তোমাদের বিবাহে বিলম্ব হইয়া গিয়াছে; যাউক, শীঘ্রই উহা সম্পন্ন করিব।" এই বলিয়া চন্দনসিংহকে লইয়া মহারাজ চলিয়া যাইলেন।

মাধুরী, চিত্রিতপুত্তলিকার ন্যায় উপবিষ্টা রহিল। তাহার কর্ণে ক্ষণে ক্ষণে 'কাঙ্গুর রাজ্য-প্রবেশ-নিষেধ' রাজার এই আদেশ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। পিতার তিরস্কারে অভিমানে নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা নির্গত হইতেছিল। মনে মনে মাধুরী বলিল, "হা ভগবন্! আজ এই হতভাগিনীর জন্যই কাঙ্গুর বিজয়শির নত হইল। যাহার লক্ষিত সুঠাম বীরবপু দর্শকবৃন্দের নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল, আজ হইতে আর কেহই তাহাকে দেখিবে না! এই বজ্রকঠোর আদেশ যখন তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইবে, হয় ত সে অভিমানে—।" মাধুরী আর ভাবিতে পারিল না, ভাবনা-সমুদ্র ভেদ করিয়া অশ্রুর উত্তাল তরঙ্গ বহিতে লাগিল। প্রথম-দর্শনাবধি প্রত্যেক কথা মনে করিয়া মাধুরী অশ্রুসিক্ত-নয়নে কক্ষতলে পড়িয়া দারুণ যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পিতার নিকট তিরস্কৃত হইয়া অবধি

মাধুরী কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়িনী। দেশ-দেশান্তর হইতে বহু সুবিজ্ঞ চিকিৎসক আসিয়াছেন, কিন্তু কেহই রোগনির্ণয় করিতে সমর্থ হন্ নাই। সকলেই এক প্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। রাণী মাধুরীর রোগ-প্রতিকারের নিমিত্ত নানা দেবদেবীর নিকট মানসিক করিয়াছেন। রাজা চন্দনসিংহকে আশা দিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই তাহার সহিত মাধুরীর বিবাহ দিবেন, কিন্তু একণে মাধুরীর বিবাহের পরিবর্ত্তে তাহার চিরবিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। চন্দনসিংহ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মাধুরীর শুশ্রূষা করিতেছিল। মনে মনে ভাবিতেছিল, 'হায়, আমিই বোধ হয় উহার অকাল-মৃত্যুর কারণ হইলাম। কেনই বা মহারাজকে মাধুরীর সম্বন্ধে বলিলাম! তাহা না হইলে, মহারাজ ত উহাকে তিরস্কার করিতেন না এবং মাধুরীও মনোবেদনায় এইরূপ ভীষণরোগে আক্রান্ত হইত না। যাহা করিলে মাধুরী একণে আরোগ্য লাভ করে, আমি জীবন বিনিময়েও তাহা করিতে প্রস্তুত। এইরূপ অহর্নিশ ভাবিতে ভাবিতে চন্দনসিংহের চিত্তপরিবর্ত্তন ঘটিল এবং মাধুরীকে তাহার মনোভাব বুঝাইবার জন্য সে সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

মাধুরীর আজ দশ দিন অজ্ঞানাবস্থার পর একটু জ্ঞানের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। চন্দনকে তাহার শয্যোপরি বিমর্ষ বদনে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া মাধুরী বলিল, "কে চন্দন! আর কেন আমার আশা করিতেছ! আমি ত চলিলাম। তোমাকে কত ভৎসনা করিয়াছি, ছোট ভগিনীর অপরাধ বলিয়া ক্ষমা করিও।"

চন্দন আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল ও বলিয়া উঠিল, "মাধুরি, দিদি আমার, আমা হইতেই তোমার এই দুর্দ্দশা। তোমাতে আর আমার কোন স্পৃহা নাই। আজ হইতে আমরা ভাই-ভগ্নী। তুমি নীরোগ হও। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, কানন সিংহের সহিতই তোমাকে মিলিত করিব।"

মাধুরীর চক্ষুর্দ্বয় উজ্জল হইয়া উঠিল এবং তাহার রোগক্লিষ্ট বদনে যেন একটু আনন্দের ছায়া পড়িল। অল্পক্ষণ পরেই মাধুরী নিদ্রিতা হইল।

কি আশ্চর্য্য! পরদিন সকলেই দেখিল যে, মাধুরীর রোগের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আজ মাধুরী যেন অনেকটা সুস্থ। চন্দনের মুখে কাননের সহিত মিলিত হইবার আশা তাহার এই কঠিন রোগে মৃত-সঞ্জীবনীর কাজ করিয়াছে!

যে রাজ্য মাধুরীর অসুস্থতায় শোকাচ্ছন্ন হইয়াছিল, আজ সেই রাজ্যে আনন্দের লহরী জাগিয়া উঠিয়াছে। এইরূপ কিছুদিন পরে মাধুরী অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলে, চন্দনসিংহ মহারাজ বিনোদসিংহের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, "মহারাজের নিকট আমার একটী প্রার্থনা আছে; আশা করি, মহারাজ আমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন্।"

রাজা বলিলেন, "কি প্রার্থনা তোমার, চন্দন সিংহ? মাধুরী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইলেই তোমাদের বিবাহ দিব। এতদিন এ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যাইত, যদি মাধুরী পিড়ীতা না হইত।"

চন্দনসিংহ অবনত মস্তকে বলিল, "মহা-

রাজ, আমার প্রার্থনা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। আমি মাধুরীকে বিবাহ করিতে পারিব না। তাহার অপেক্ষা মাধুরীর সহিত অতিপবিত্র বন্ধনে বদ্ধ হইয়াছি। মাধুরী আমার ছোট ভগ্নী। কাননের সহিত তাহার বিবাহ দিন্।"

মহারাজ চন্দনের কথায় চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চন্দন, তুমি কি বলিতেছ? তুমি কি জান না যে তোমাকে মাধুরী সমর্পণ করিতে আমি তোমার পিতার নিকট সত্যাবদ্ধ! তুমি কি আমাকে সেই সত্যের অপলাপ করাইতে চাও! নিশ্চয়ই ইহা তোমার বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল মাত্র। এইরূপ আর কখনও বলিও না।"

চন্দন সিংহ দৃঢ়তার সহিত বলিল, "না মহারাজ, ইহা আমার বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল নহে। ইহা অতি পরিষ্কার সত্য কথা। তবে শুনুন, আমি রাজ্যলোভেই মাধুরীকে বিবাহ করিতে অভিলাষী ছিলাম। মাধুরীকে বিবাহ করিলে আপনার অবর্ত্তমানে আমি সিংহাসনে বসিব, এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হইয়া আমি মাধুরীর সহিত সত্বর বিবাহের জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছিলাম এবং আপনার নিকটে মাধুরীর বিপক্ষে অভিযোগ করিয়াছিলাম। এই অভিযোগের ফলই তাহাকে মৃত্যুর পথে লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু জানি না মাধুরীর অবস্থা দেখিয়া কোন্ অজ্ঞাত কারণে আমি তাহাকে ভগ্নী বলিয়া সম্বোধন করিলাম এবং তাহার রুগ্ন শয্যায় কাননের সহিত বিবাহ দিবার প্রতিজ্ঞা করিলাম। আমার সেই প্রতিজ্ঞা মাধুরীকে মৃত্যুর পথ হইতে ফিরাইয়া আনিল। আপনি এখন স্বচ্ছন্দচিত্তে কাননের সহিত মাধুরীর পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করুন্। ইহাতে আপনাকে সত্যভঙ্গের কোন পাপ স্পর্শ করিবে না। আমি এ-বিষয়ে পিতারও সম্মতি লইব।" এই বলিয়া চন্দনসিংহ দ্রুতপাদবিক্ষেপে কক্ষ হইতে চলিয়া গেল।

মহারাজ বিনোদসিংহ চন্দনের এইরূপ অকস্মাৎ পরিবর্ত্তনে স্তম্ভিত হইলেন ও "তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক্," এই বলিয়া পুনঃরায় শয্যাগ্রহণ করিলেন্। মাধুরী সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলে মন্ত্রীর আগ্রহাতিশয্যে মহারাজ বিনোদসিংহ বহু অন্বেষণে কাননকে আনাইয়া তাহার সহিত মাধুরীর ও চন্দনসিংহের সহিত মালতীর পবিত্র পরিণয়কার্য্য মহাসমারোহে সম্পন্ন করিলেন এবং কাননসিংহকে রাজপদে ও চন্দনসিংহকে মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। বলা বাহুল্য, কাননের মাতা যথাসময়ে মাধুরীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন।

(সমাপ্ত)

শ্রীকুলবালা দেবী।

গান।

ঘরের ছেলে আন্‌লি ঘরে,
  সেই ভালো মা, সেই ভালো!
খুলে গেল অন্ধ-নয়ন,
  দেখা দিল নূতন আলো!
ভুলেছিলাম হট্টগোলে
  চেয়ে সবার মুখ-পানে!
ছুটেছিলাম ক্ষেপার মত
  মত্ত হ'য়ে অভিমানে!
সে মোহ আজ টুটিলি মাগো,
  পরশ করি দৃঢ় করে!
বুঝিয়ে দিলি ধরার আশা—
  মায়া কেবল মরু প'রে!
স্বপনখানি ঘুচ্‌ল যদি
  জীবন-ধারা তবে ঢালো!
আমার ছোট কুটীর-কোণে
  পূজার বাতি শুধু জ্বালো!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

আমার প্রায়শ্চিত্ত।

(১)

সে-দিনও এমনি করিয়া বসন্তবাতাস ধীরে ধীরে বহিতেছিল, এমনি করিয়া জ্যোৎস্নাকিরণ আকাশের গায়ে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; এমনি করিয়া সেদিনও ভাগীরথীর জ্যোৎস্নামাখা ঢেউগুলি ভাগীরথী-বক্ষে নাচিতে নাচিতে সমুদ্রমুখে ছুটিতেছিল। কিন্তু সে-দিন আর আজ! জটিল মানব-জীবনের একটি দুরূহ সমস্যা ভেদ করিবার জন্য সেদিন আমি শান্ত-সলিলা ভাগীরথীর তীরে দাঁড়াইয়াছিলাম, আর আজ অতীতের তীব্র নিস্মৃতি লইয়া নিভৃতে তাহার কূলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

সে-বার আমি বিলাত হইতে ডাক্তারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম বাড়ী আসিয়াছি। অনেক দিন হইতে আমরা এলাহাবাদে বাস করিতেছিলাম। বাবা যখন আমাদের লইয়া প্রথম এলাহাবাদে আসেন, তখন আমার বয়স দশ বৎসর মাত্র। সহরের যে-দিকে আমরা থাকিতাম, সে-দিকে অধিক লোকের বসতি ছিল না। প্রথম প্রথম লোকজনাভাবে আমাদের অত্যন্ত নির্জ্জন বোধ হইত। আমাদের বাড়ীর অনতিদূরে চারিদিকে বাগানবেষ্টিত একখানি দ্বিতল গৃহ ছিল। এই গৃহের গৃহকর্ত্তা অতুলচন্দ্র রায় অনেক দিন হইতে তাঁহার এলাহাবাদের বাড়ী ছাড়িয়া মিরাটে বাস করিতেছিলেন। আমরা এলাহাবাদ যাইবার দুইবৎসর পর তিনি সপরিবারে এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলেন। দুইবৎসরের নির্জ্জনতার পর তাহাদিগকে প্রতিবেশিস্বরূপ পাইয়া মা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। বিশেষতঃ নিকটে আর কোনো খৃষ্টীয়ান পরিবার ছিল না; এইজন্য তাঁহাদের সহিত প্রথম আলাপেই আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে কেমন একটা আত্মীয়তা জন্মিয়া গেল। অতুলবাবুর পাঁচবৎসরের কন্যা লীলার সহিতও

আমাদের সকলের বিশেষ ভাব হইয়া গেল! এমন কি সে-দিন সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, মা একাকী জানালার নিকট বসিয়া কাঁদিতেছেন; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আমার যে ছোট ভগ্নীর কয়েকবৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল, লীলাকে দেখিয়া মায়ের তাহার কথা স্মরণ হওয়াতে তিনি কাঁদিতেছেন! বলা বাহুল্য, সেইদিন হইতে লীলা মায়ের হৃদয়ের শূন্য স্থানটি অধিকার করিয়া বসিল।

তাহার পর কয়েক বৎসর কাটিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রথম আলাপেই অতুলবাবুদের সহিত আমাদের বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল; ক্রমে তাহা অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। মা প্রায়ই তাঁহাদের বাড়ী যাইতেন, অতুলবাবুর স্ত্রীও যখনই সময় পাইতেন আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিতেন। লীলা আমার খেলার সাথীরূপে আমারই সহিত খেলা করিত, আমারই সহিত বেড়াইতে যাইত। আমি ফল, ফুল, পাখীর ডিম প্রভৃতি যেখানে যাহা পাইতাম তাহা তাহাকে আনিয়া দিতাম, সেও এই সকল খেলার সামগ্রী পাইয়া যার পর নাই আহ্লাদিত হইত।

আমার বয়স যখন উনিশ বৎসর তখন এফ্-এ পরীক্ষার পর বাবা আমাকে বিলাত যাইয়া ডাক্তারি শিখিতে বলিলেন। আমরাও ছেলেবেলা হইতে ডাক্তারির দিকে বিশেষ একটা ঝোঁক ছিল। বাবাকে ঔষধপত্র ঢালাঢালি করিতে দেখিয়া আমি ছেলেবেলা হইতেই মনে মনে সংকল্প করিয়াছিলাম, বড় হইলে ডাক্তারি শিখিব। সুতরাং, বাবার প্রস্তাবে আমার আপত্তির কোনই কারণ রহিল না। কিছুদিনের মধ্যে আমি সুজলা সুফলা জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া ইংলণ্ড যাত্রা করিলাম।

যথাসময়ে ডাক্তারি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও বাবার আদেশমত আমাকে কিছুদিন বিলাতে থাকিতে হইল। বিলাত যাইবার পর প্রথম প্রথম আমি অতুলবাবুকে পত্র লিখিতাম। এক বৎসর পর মায়ের পত্রে জানিলাম অতুলবাবুর স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে এবং লীলাকে লইয়া তিনি মিরাটে তাঁহার ভ্রাতার নিকট চলিয়া গিয়াছেন।

ছয় বৎসর পর আমি বাড়ী ফিরিলাম। সেই দীর্ঘ প্রবাসের পর জন্মভূমির উপকূল দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন মাতৃভূমি বহুদিনের বিচ্ছেদের পর আপন সন্তানকে বক্ষে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছেন। মাতৃদেবীও অনেক দিনের পর তাঁহার একমাত্র সন্তানকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইলেন।

বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, কিছুদিন পূর্ব্বে অতুলবাবু তাঁহার এক ভগ্নী ও লীলাকে লইয়া এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মিরাটে তাঁহার শরীর বিশেষ সুস্থ ছিল না, এইজন্য তিনি এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

অতুলবাবুর বয়স কিছু অধিক হইয়াছিল, লীলা তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের কন্যা। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি বার বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই।

পরদিন বৈকালে আমি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার জন্য তাঁহাদের বাড়ী গেলাম। সম্মুখে বারান্দায় তাহাদের সহিত আমার দেখা হইল। অতুলবাবু একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া খবরের কাগজ

পড়িতেছিলেন, পার্শ্বে তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয়া কন্যা লীলা মাথা নীচু করিয়া সেলাই করিতেছিল। লীলার কালো কালো কোঁকড়া চুলগুলি মুখের উপর পড়িয়া তাহার সুন্দর মুখখানি ঈষৎ ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া ছয়বৎসর পূর্ব্বের তাহার হাসিমাখা বালিকা-মুখখানি আমার মনে পড়িল। অতুলবাবু আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি নির্ম্মল, কখন এলে?"

তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, আমি লীলার দিকে ফিরিয়া তাহাকে নমস্কার করিলাম। সে তাহার স্নিগ্ধ সলজ্জ চক্ষু-দুইটি মুহূর্ত্তের জন্য আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া আমার নমস্কার প্রত্যর্পণ করিল। কিছুক্ষণ কথা-বার্ত্তার পর সে-দিন বাড়ী ফিরিলাম।

(২)

অনেক বৎসর পর লীলার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল, সুতরাং প্রথমে সে আমাকে কিছু লজ্জা করিত, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে সে লজ্জা তিরোহিত হইয়া গেল। পূর্ব্বের ন্যায় আবার সে অসঙ্কোচে আমারসহিত কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিল। মা তাহাকে কন্যাধিক স্নেহ করিতেন, সেও প্রত্যহ একবার করিয়া আমাদের নিকট আসিত। আমি আবার মধ্যে মধ্যে তাহাদের বাড়ী যাইয়া গল্প জুড়িয়া দিতাম।

একদিন মা আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "এখন সমস্তই হ'ল, এইবার একটা বিবাহ কর।" মায়ের গম্ভীর মুখ দেখিয়া আমি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলাম, 'সত্যি নাকি?" কিন্তু তিনি দ্বিগুণ আগ্রহের সহিত বলিলেন, "না বাবা, হাসির কথা নয়। আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি এখন বিবাহ করিলে আমরা অত্যন্ত সুখী হইব। তোমাকে সংসারে সুস্থির করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিলে, তোমার পুত্রের মুখ দেখিয়া মরিতে পারিলে, আমাদের সকল সুখ, সকল আশা পূর্ণ হইবে।"

আমি কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় বলিলাম, "এখন কি, বিবাহের অনেক সময় প'ড়ে আছে!" মা আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "লীলাকে দেখেছ ত? তাকে তোমার কেমন লাগে? মেয়েটি দেখ্‌তে যেমন সুন্দর, তার স্বভাবও তেমনি মিষ্টি। তাকে বিবাহ ক'র্‌বার কোনো আপত্তি আছে? তুমি হয় ত তাকেই পছন্দ ক'রে রেখেছ? আমরা তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করি; সুতরাং, এ বিবাহে আমরা অতিশয় সুখী হইব। তাহাকে বিবাহ করিলে আমার প্রাণের শেষ আশাটি পূর্ণ হইবে। বল বাবা, তাহাকে বিবাহ করিয়া আমাদের সুখী করিবে।'

মায়ের কথা শুনিয়া আমি কিছু চিন্তিত হইলাম। লীলাকে আমি বিবাহ করিব, একথা যেন কি রকম নূতন বোধ হইল। সত্য কথা বলিতে কি, আমি তখনও বিবাহের কথা একবারও ভাবি নাই। মাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসিতাম; লীলাকে বিবাহ করিলে তিনি সুখী হইবেন, শুনিয়া তাঁহার কথায় সম্মতি দিলাম। লীলাকে বিবাহ করিবার কোনো আপত্তির কারণও দেখিলাম না। সুতরাং মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে, তাহা তাঁহাকে জানাইলাম। মা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আমাকে বারংবার আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সে-দিন বিকালে অন্যান্য দিনের ন্যায় লীলা মাকে দেখিতে আসিল। বাড়ী ফিরিতে কিছু দেরী হইল দেখিয়া, মা আমাকে তাহার সহিত যাইতে বলিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমাদের দুই বাড়ীর ভিতর বিশেষ আত্মীয়তা জন্মিয়া গিয়াছিল। সুতরাং, লীলার সহিত আমার যাওয়া কোনই আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া কাহারও বোধ হইল না। সকালে মায়ের সহিত যে কথা হইয়াছিল, তাহা আমার মনে ছিল। সে-দিন লীলার সহিত যাইবার সময় তাহাকে একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলাম। বুঝি বা আমার দৃষ্টিতে কিছু ছিল, কারণ অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিন লীলা তেমন সহজভাবে আমার সহিত কথা বলিতে পারিল না। আমি যতবার তাহার দিকে চাহিতেছিলাম, সে যেন বিশেষ অপ্রতিভ হইতেছিল। সে-দিন তাহাকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আমি বাড়ী ফিরিলাম; মনে মনে ভাবিলাম, পরদিন বাড়ী ফিরিবার সময় লীলার সহিত যাইয়া তাহাকে সকল কথা জানাইব। কিন্তু পরদিন লীলা আর আমাদের বাড়ী আসিল না। তাহার পর এক দুই করিয়া চারিদিন কাটিল, লীলা আমাদের বাড়ী আসিল না। আমি বুঝিলাম এ আমারই অপরাধের প্রতিফল। তিন চারি দিন সে না আসাতে আমারও কিছু একা একা বোধ হইতে লাগিল। আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলাম, আমি তাহাকে ভালবাসি।

পরদিন আমি নিজেই তাহাদের বাড়ী যাইয়া উপস্থিত হইলাম। লীলা বাগানে দাঁড়াইয়া গাছে জল দেওয়া দেখিতেছিল। নিকটে যাইয়া আমি তাহাকে বলিলাম, "লীলা, তুমি যে আমাদের বাড়ী যাওয়া একেবারে ছেড়ে দিলে? মা ত তোমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।" সম্মুখ হইতে একটি গোলাপ ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে লীলা বলিল, "আজ ক'দিন থেকে বাবার শরীর তত ভাল নাই, সেই জন্ম কোথাও বেরুতে পারি নাই।"

ভিতরে যাইয়া দেখিলাম অতুলবাবুর শরীর কিছু অসুস্থ, কিন্তু সে অসুস্থতার জন্ম লীলা বাড়ীর বাহির হইতে পারে নাই, এ কথা তত বিশ্বাসযোগ্য বোধ হইল না। সে-দিন কিন্তু কিছুতেই সে আমার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না। আমার সহিত মাকে দেখিতে যাইবে বলিয়া স্বীকৃতা হইল। সেইদিনই সুবিধা বুঝিয়া আমি তাহার হস্ত প্রার্থনা করিলাম। উত্তরে লীলা আমাকে কিছুই বলিল না, কিন্তু তাহার লজ্জিত আরক্তিম মুখখানি, স্নিগ্ধ আনত চোখ-দুটি, তাহার হৃদয়ের সম্মতি আমাকে জানাইয়া দিল। পরদিন অতুলবাবু ও বাবার সম্মতিক্রমে আমাদের এন্‌গেজমেণ্ট হইয়া গেল।

(৩)

আমাদের বিবাহের তখন আর একমাস বাকি। দিন তারিখ স্থির হইয়া গিয়াছে। এ বিবাহে মায়ের আনন্দের সীমা রহিল না। অতুলবাবু আমাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "নির্ম্মল, লীলাকে তোমার হাতে দিয়া আমি যে কতদূর সুখী হইয়াছি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না। জীবনে আমার যে জিনিষটি সকলের অপেক্ষা বহুমূল্য ছিল, তাহাই তোমার হাতে দিলাম। তুমি

তাহার উপযুক্ত যত্ন করিও।" আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিলাম, "সমস্ত শক্তি, সমস্ত সামর্থ্য দিয়া করিব।"

এনগেজমেণ্টের পর আমি প্রত্যহ লীলাদের বাড়ী যাইতাম; কখন কখন তাহাকে লইয়া আমাদের শৈশবের ক্রীড়াস্থান-গুলি দেখিতে যাইতাম। লীলা যখন তাহার সুন্দর কালো কালো চোখদুইটি আমার মুখের দিকে তুলিয়া আমার সহিত কথা বলিত, তখন তাহার চোখের উজ্জ্বল দীপ্তিতে তাহার হৃদয়ের গভীর আনন্দ যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। আমার সহিত বিবাহে সে যে কত সুখী, তাহা তাহার নীরব চোখের অব্যক্ত চাহনি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া দিত।

আমাদের বাটী হইতে কয়েক মাইল দূরে যে উপাসনা-গৃহ, সেখানে আমাদের বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছিল। অতুলবাবুর ইচ্ছা ছিল, তাঁহার ভ্রাতা সপরিবারে আমাদের বিবাহে যোগ দেন, কিন্তু কোনো অসুবিধা-বশতঃ তিনি আসিতে পারিলেন না। লীলার জন্য তিনি সুন্দর একটি উপহার পাঠাইয়া লিখিলেন যে, "মায়ার ছুটি হইলে সে বিবাহে যাইতে পারিবে।" তাঁহার কন্যা মায়া কলিকাতায় পড়িতেছিলেন। লীলার ইচ্ছা-মত তাহাকে Bride's maid (নিত-কোনে) করা হইবে স্থির হইল।

ইহার পর লীলা প্রায়ই আমার নিকট মায়ার গল্প করিত। মিরাটে থাকিতে তাহারা দুইজনে সমস্তক্ষণ কি করিত, কি ভাবে সময় কাটাইত ইত্যাদি নানা গল্প করিয়া সে আমাকে শুনাইত। তাহার কথাবার্ত্তায় আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম, ভগ্নীটি তাহার নিতান্তই প্রিয়। বলিতে লজ্জা হইতেছে, লীলার নিকট মায়ার অতিরিক্ত সুখ্যাতি শুনিয়া প্রথম হইতেই তাহার উপর আমার একটা অনুরাগের ভাব জন্মিয়া গেল।

একদিন বিকালে আমি অতুলবাবুদের বাড়ী গেলাম; দুর্ভাগ্যক্রমে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। পার্শ্বের ঘরে পর্দ্দা উড়িতেছিল; বোধ হইল, লীলা কৌচের উপর বসিয়া আছে। নিঃশব্দে ভিতরে যাইয়া তাহাকে হাসাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু গিয়া দেখিলাম একখানি বই পড়িতে পড়িতে সে কৌচের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বইখানি তাহার হাত হইতে মাটীতে পড়িয়া গিয়াছে। তাহার মুক্ত কুঞ্চিত চুলগুলি মুখের উপর গুচ্ছে গুচ্ছে পড়িয়া মুখখানিকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে! তথাপি তাহার উজ্জ্বল মুখশ্রী যেন তাহার ভিতর দিয়া বাহির হইবার জন্য উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ তাহাকে অতিসুন্দর দেখাইতেছিল! আমি একমুহূর্ত্ত নীরবে দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিলাম, পরে ধীরে ধীরে ডাকিলাম—"লীলা"!

আমার কণ্ঠস্বরে নিদ্রিত ব্যক্তি জাগিয়া উঠিয়া বসিল। ধীরে ধীরে মুখের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া সে যখন আমার দিকে চাহিল, তখন আমি বুঝিলাম, কি ভুলই করিয়াছি। মায়া আমাকে অপ্রতিভ দেখিয়া একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনি বসুন, আমি দিদিকে ডেকে আনচি।" পর-মুহূর্তে লীলা আসিয়া আমাকে বলিল, "একটু বস, আমি এখনি আস্‌চি" এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে মায়াকে আমার নিকট

আনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "বল ত কা'কে এনেছি?"

মায়া একবার অর্থপূর্ণ হাসিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "দিদি, তোমায় আর আলাপ করিয়ে দিতে হবে না, আলাপ আগেই হয়ে গেছে। নির্ম্মলবাবুকে জিজ্ঞাসা কর না কেন?" ইহা বলিয়া সে কৃত্রিম সহানুভূতির সহিত আমাকে বলিল, "বলেন ত ক্ষতিটা পূরণ করে দিই।" কথাগুলি বলিয়া সে হা হা করিয়া হাসিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লীলা ডাকিল "মায়া!" আমিও ডাকিলাম—"মায়া!"

"পিসিমা ডাক্‌চেন" বলিয়া মায়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বাগানে চলিয়া গেল। আমি লীলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মায়া তাহার কতদিনের ছোট? সে বলিল, দেড় বৎসরের।

তাহার পর আমি যখনই তাহাদের বাড়ী যাইতাম, মায়া সুবিধা পাইলেই আমার নিকট আসিয়া আমাকে নানাভাবে জ্বালাতন করিয়া তুলিত। আমাকে ঠকান, আমাকে রাগান, আমাকে হাসান যেন তাহার কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল কার্য্যে সে যারপর নাই আনন্দ অনুভব করিত। আমরাও তাহার ব্যবহারে অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিতাম। সে তাহার চঞ্চল অথচ সরল ভাব, মিষ্ট অথচ উচ্চহাসি, তাহার ছেলেমানুষী দ্বারা বাড়ীর সকলকে উত্তেজিত করিয়া তুলিত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে আমি বুঝিতে পারিলাম, কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে। আমি লীলাকে দেখিতে যাইতাম কিন্তু যে-দিন মায়া না আসিত সে-দিন সকলই শুষ্ক, সকলই নীরস বোধ হইত। বাড়ী আসিয়াও মায়ার মুখ, মায়ার হাসি, মায়ার চঞ্চলতা সমস্ত সময় আমার মনে হইত। আমাদের বিবাহের তখন দশ-বার দিন বাকি ছিল। যতবার আমি সে বিষয় চিন্তা করিতে চেষ্টা করিতাম, ততবার কে যেন সকল চিন্তা ঠেলিয়া মায়ার ছবিখানি আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিত। মায়াকে ফেলিয়া লীলাকে বিবাহ করিব, এ চিন্তা হৃদয়ে স্থান দেওয়া আমার নিকট অত্যন্ত কঠিন বোধ হইত। যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, আমার অজ্ঞাতে মায়া আমার হৃদয়ের কতখানি অধিকার করিয়া ফেলিয়াছে! মাতার উপর আমার অত্যন্ত রাগ হইতে লাগিল; ভাবিলাম তাঁহার জন্যই ত আমি না বুঝিয়া লীলাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। মায়া ব্যতীত যে আমার সমস্ত জীবন শূন্য, সমস্ত জীবন অন্ধকারময় হইবে! লীলার কথাও আমার মনে পড়িল। সে যে আমাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসে! তাহার গভীর বিশ্বাসে কি করিয়া কুঠারাঘাত করিব? নিজের উপর আমার ঘৃণা হইতে লাগিল। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলাম, কপালে সুখ-দুঃখ যাহাই থাকুক, লীলাকে কখনই প্রতারণা করিব না।

কিন্তু প্রত্যহ এইভাবে মায়ার সহিত আলাপ, মায়ার সহিত কৌতুক করিলেও যে চলিবে না, তাহাও বুঝিলাম। উপাসনা-মন্দিরে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া আমি লীলার পাণি-গ্রহণ করিব, আর মায়া তাহা অবাধে দেখিবে, তাহা লইয়া আমোদ করিবে, এ চিন্তাও আমার একেবারে অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। আমি স্থির করিলাম, বিবাহের পূর্ব্বে তাহাকে কোনো প্রকারে অন্যত্র পাঠাইতে হইবে।

মনে মনে এই সংকল্প করিয়া তাহাদের বাটী গেলাম। তখনও বিবাহের এক সপ্তাহ বাকি। লীলার সহিত ড্রয়িংরুমে দেখা হইল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই অতুলবাবু বিশেষ প্রয়োজনে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে মায়াকে আমার নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল।

মায়ার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমি তাহাকে বলিলাম, "মায়া, তোমাকে আমার একটি কথা রাখিতে হইবে।......"

আমি যে তাহাকে বিবাহের পূর্ব্বে বাড়ী যাইতে বলিতেছি, তাহাকে আমাদের বিবাহে bride's maid হইতে বারণ করিতেছি, একথা শুনিয়া প্রথমে সে বিস্মিত হইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; পরে হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল, "ইস্, তাই ত! আমাকে ঠকাবেন্ ভেবেছেন! আমি যাচ্ছি যাই কি?" আমার কথা শোনা দূরে থাক্, তাহার সুন্দর ছোট হাতদুইখানি আমার সম্মুখে ঘুরাইয়া সে বলিল, "দাঁড়ান্, দিদির কাছে নালিশ কচ্ছি।"

আমি তাহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "না মায়া, আমি ঠাট্টা কর্‌চি না। সত্যই তোমাকে বিবাহের পূর্ব্বে বাড়ী যাইতে বলিতেছি। কিন্তু আমার বিশেষ অনুরোধ, তোমার দিদি যেন এ বিষয় কিছু জান্‌তে না পারেন্। তুমি কি কোনো কারণ দেখিয়ে যেতে পার না?"

মায়া প্রথমে কিছুতেই আমার কথায় কান দিতে চাহিল না। শেষে আমার অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ও অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়া বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "আপনাদের বিবাহেই এসেছিলাম। আপনি নিজেই যখন যেতে বল্‌ছেন, আমি যাব।" কথাগুলি বলিয়া সে তাহার হাসিমুখ-খানা একেবারে ম্লান করিয়া উঠিয়া যাইতেছিল, আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "মায়া, যদি জানিতে কেন আমি এতটা আনন্দ থেকে তোমাকে বঞ্চিত কর্‌চি, তা হ'লে আমাকে এত নিষ্ঠুর এত হৃদয়হীন ভাব্‌তে না।" সে আমার কথার কোন উত্তর দিল না, কেবল তাহার সুন্দর পাতলা ঠোঁট-দুইখানি একটু ফুলাইয়া চোখ্‌ভরা জল লইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। আমি আর কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না। কি করিতেছি, কি বলিতেছি, কিছু বিবেচনা না করিয়াই উন্মাদের ন্যায় তাহাকে সকলই বলিয়া ফেলিলাম।

আর মায়া?—মায়া যখন আমার প্রলাপের অর্থসংগ্রহ করিতে পারিল, তাহার সে চঞ্চল বালিকামূর্ত্তি নিমেষের মধ্যে কোথায় মিশাইয়া গেল! বুঝি বা লজ্জায় ঘৃণায় তাহার কর্ণমূল-পর্য্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল! সে আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিল, আমার কথা শুনিবে না বলিল এবং শেষে তাহার সুন্দর হাতদুইখানি দ্বারা দুইকর্ণ চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "ছিছি, দিদি শুন্‌লে কি বল্‌বে!!"

যখন আমি কথা শেষ করিলাম, বোধ হইল, পার্শ্বের ঘরে কাহারও মৃদুপদ-শব্দ শুনিলাম; মায়াও সেই মুহূর্ত্তে আমার নিকট হইতে চলিয়া গেল। সে দিন আর লীলার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমার শরীর ভাল নাই, ইহা লীলার জন্য লিখিয়া রাখিয়া আমি বাহির হইয়া গেলাম।

(৪)

কতক্ষণ আমি ভাগীরথী-তীরে আমার দুঃসহ হৃদয়ভার লইয়া পাদচারণা করিয়াছিলাম, জানি না। যখন আমার চৈতন্য হইল, দেখিলাম বসন্তের নৈশবায়ু ধীরে ধীরে আমার গাত্রে হাত বুলাইয়া আমার হৃদয়ের তাপ জুড়াইয়া দিতেছে; মেঘের আঁধার ঠেলিয়া ফেলিয়া চাঁদ আকাশে উঠিয়া দিগন্ত প্লাবিত করিতেছে। রাত্রি অনেক হইয়াছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিলাম। মা আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এখনো খাওয়া হয় নাই। এস খাবে এস।"

বাবা জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিলেন; আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি অতুলবাবুদের বাড়ী থেকে আস্‌ছো না-কি?" আমি বলিলাম, "না।" তিনি আমাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ ত ও-দিক্‌টা যেন লাল হ'য়ে উঠেছে! কাহারো বাড়ীতে আগুন লাগ্‌লো না ত? একবার দেখে এলে হ'ত।"

তখনি আমি আবার অতুলবাবুদের বাড়ী ছুটিলাম; যাইয়া দেখিলাম, সত্যই তাঁহাদের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে, চারিদিক্ লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। দূর হইতে অতুলবাবু, পিসিমা ও লীলাকে বাড়ীর ভিতর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম। ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইলাম। নিকটে যাইয়া লীলা অথবা মায়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, ব্যস্ত হইয়া অতুলবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কোথায়? দেখিলাম, উপরের ঘরে একটি জানালার নিকট লীলা মায়াকে জড়াইয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে; ভয়ে তাহারা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। সিঁড়িতে তখন আগুন লাগিয়া গিয়াছিল। আমার চীৎকারে কে যেন একখানি মই লইয়া আসিল; তাহা আবার জানালা হইতে দুইহাত ছোট। তাড়াতাড়ি তাহাই লাগাইয়া দিয়া দ্রুতপদে উপরে উঠিতে লাগিলাম। উঠিবার সময় শুনিতে পাইলাম, লীলা মায়াকে আগে নামিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে। সে মায়াকে বলিতেছিল, "ভয় ক'র না, এই যে নির্ম্মলবাবু আস্‌ছেন, আমাদের দু'জনকেই নামিয়ে দেবেন, কিন্তু তুমি লক্ষ্মী মেয়ের মত আগে যাবে, কেমন?" মায়া বলিল, "না দিদি, তুমি আগে যেও।" আমি দেখিলাম তর্কের সময় নাই। তাহাদের মধ্যে কাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিলাম জানি না; দেখিলাম, আমার কণ্ঠস্বরে মায়া অগ্রসর হইয়া আসিল। আমি তাহাকে লইয়া দ্রুতপদে নীচে নামিলাম। মায়াকে রাখিয়া ফিরিয়া দেখিলাম, লীলার চতুষ্পার্শ্বের দরজায় আগুন লাগিয়া গিয়াছে, প্রগাঢ় ধূমরাশিতে তাহার শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইতেছে। আবার দ্রুতপদে উপরে উঠিলাম, নিকটে যাইয়া তাহাকে ডাকিলাম। অগ্রসর না হইয়া লীলা মৃদুস্বরে আমাকে বলিল, "তুমি আমার একটি কথা রাখিবে কি?" আমি বলিলাম লীলা কোন্ দিন তোমার কোন্ কথা রাখিতে ত্রুটি করিয়াছি? এখন যে কোনো কথার সময় নাই!" এই বলিয়া আমি তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, কিন্তু এ কি! আমি শিহরিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলাম। কে তাহার চিরহাসি-মাখা চিরোজ্জ্বল মুখখানির উপর এমন মলিন কালিমার আবরণ দিয়া চলিয়া গেল? কে

এত অল্পকালের মধ্যে তাহার শুভ্র কোমল ললাটের উপর এতগুলি কঠিন বেদনার রেখা আঁকিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে?

লীলা অগ্রসর হইয়া আমার হাত ধরিয়া বলিল আজ মৃত্যুর পূর্ব্বে আমি তোমাকে যে অনুরোধটি করবো তা তুমি পায় ঠেলতে পারবে না। আজ মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে মায়াকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি, তুমি তাহাকে বিবাহ করিও। তোমরা সুখী হও, ইহাই অন্তরের সহিত কামনা করিতেছি। কিন্তু তোমার দীর্ঘ সুখময় জীবনে দুই একবার লীলাকে স্মরণ করিতে পারিবে কি? জেনো তোমার—" আমি আর শুনিতে পারিলাম না। সে কি আর্ত্ত ব্যথিত কণ্ঠ! সে কি করুণ প্রশান্ত মূর্ত্তি! কিন্তু সে মূর্ত্তিও যে তাহার হৃদয়ের তীব্র বেদনা লুকাইতে পারিতেছিল না! তাহার সে নিরাশ ব্যথিত কণ্ঠ আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে গিয়া আঘাত করিল। পশ্চাৎ হইতে অগ্নি তাহার ভীষণ শিখা প্রসারণ করিয়া আমাদিগকে লেহন করিতে আসিতেছিল। আমি তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া লীলাকে লইয়া বাহির হইলাম। তাহাকে সঙ্গে লইয়া দুই এক পদ নীচে নামিলাম। পূর্ব্বেই সিঁড়ির নিম্নভাগে আগুন লাগিয়া পুড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। লীলাকে স্কন্ধে লইয়া নামিতে চেষ্টা করিলাম তখনি কি একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। তাহার পর? তাহার পর সব অন্ধকার!

যখন চৈতন্য হইল, দেখিলাম আমি আমাদের বাটীতে বিছানায় শুইয়া আছি। উঠিতে চেষ্টা করিলাম, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা অনুভব হইল; আবার শুইয়া পড়িলাম। মায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আমরা পড়িয়া যাইবার পর লীলার মৃত্যু হইয়াছে, বৃদ্ধ অতুল বাবুও কন্যা-শোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। মায়া তাহার পিসীমার সহিত মিরাট গিয়াছে।

আমি গত কয়েক মাসের ঘটনাগুলি একে একে চিন্তা করিতে লাগিলাম। সকলই যেন স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। লীলার নিকট আমার বিশ্বাসঘাতকতা স্মরণ করিয়া অনুতাপে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমার ন্যায় প্রতারক, বিশ্বাসঘাতকের সুখের জন্য লীলা প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইল না। লীলা! লীলা! তুমি যে স্বর্গের দেবী, আমি সংসারের ক্ষুদ্র মানব, তাই তোমাকে ধরিতে পারি নাই।

* * * * *

তাহার পর পাঁচ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে আমি একবার মিরাট গিয়াছিলাম। মায়ার বাবার নিকট মায়ার সহিত আমার বিবাহের প্রস্তাবও করিয়াছিলাম, কিন্তু শুনিলাম, মায়া এ বিবাহে অসম্মত।

তাহার পর আজ কতদিন চলিয়া গিয়াছে। আজ কত দিনের পর তেমনি করিয়া মায়ার সহিত সাক্ষাৎকার হইল। তাহার সে চঞ্চল চাহনি এখনো তেমনি রহিয়াছে, কেবল তাহার সেই বালিকাসুলভ সরলতার মধ্যে কেমন একটা গাম্ভীর্য্যের ভাব আসিয়া তাহাকে আরো সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে!

আজ অনেক দিনের পর তাহার সহিত এই শান্ত-সলিলা ভাগীরথীর তীরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। আজও তেমনি করিয়া চাঁদ উঠিয়াছে, তেমনি করিয়া ভাগীরথীর ঢেউ-গুলি জ্যোৎস্না মাখিয়া নদীবক্ষে নৃত্য

করিতেছে। তেমনি করিয়া বসন্ত বাতাস ধীরে ধীরে বহিয়া আমাদের অঙ্গস্পর্শ করিতেছে, কিন্তু সে স্পর্শে সে যেন রহিয়া রহিয়া পুরাতন স্মৃতি জাগরিত করিয়া দিতেছে। আমি ফিরিয়া মায়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মায়া তুমি আমাকে প্রত্যাখান করিলে কেন?"

অশ্রুভরা দুটি চোখ মায়া আমার দিকে তুলিয়া বলিল,—

"পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই কি?"

এপ্রেল ফুল।

শারদ শশীর ফুল্ল জ্যোৎস্নার মত ফুটফুটে সুন্দরী 'জ্যোৎস্নাময়ী' যখন সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া, প্রভাতকুমারের নিকট দাঁড়াইল, তখন প্রভাত সে মোহিনী প্রতিমার অতুল রূপরাশি অনিমেষ লোচনে অনেকক্ষণ দর্শন করিয়া আত্মহারা ভাবে পত্নীকে কহিলেন, "একি! কোথায় যাইতেছ?"

জ্যোৎস্নাময়ী, একটু মধুর হাসি বিদ্যুতের মত অধর প্রান্তে চমকাইয়া বলিল, "সেকি এর মধ্যে ভুলে যাইতেছ? আজ যে মেজদিদির বাড়ী নিমন্ত্রণ।"

"এক্স্যাক্ট্‌লি, আজ যে তাঁর বাড়ীতে একটা 'ইভনিং পার্টী' আছে। আমাকেও যে যেতে হবে। তা ওদিকে ত ব্যারিষ্টার মিত্র পা ভেঙ্গে বসে আছেন।"

"জামাই বাবু আসতে পারেননি বলে পাছে তুমি না যাও, সেই জন্যই ত মেজদিদি নিজে এসে তোমাকে নিমন্ত্রণ করে গেছেন।"

প্রভাত একটু পরিহাসের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "তা ভগ্নীর বাড়ী যাইতেছ অত সেজেছ কেন?"

জ্যোৎস্না ভ্রূভঙ্গি করিয়া কর্ণের নীল দুল দুলাইয়া কহিল, "হিংসা হয়েছে নাকি? বলত খুলে ফেলি। তোমরা কি নিমন্ত্রণে আমন্ত্রণে সাজনা, এইত আজই মিটি বাবু সাজবে।"

"কথায় পারবার যো নাই। বলছিলাম ভালর জন্যে—আজকার উৎসবের দিনটায় কেন তোমার মেজদিদিকে কাঁদাবে?"

"আমার অলঙ্কার, আমার বস্ত্র, আমার সাজগোজ দেখে, মেজদিদি কাঁদবে, এ জীবনে কখন এমন আশ্চর্য্য কথা শুনি নাই।"

"শোন নাই, তা আজ শোন। ঐ মণি-মাণিক্য-বিভূষিত ও ললিত-লাবণ্যময়ী রাজ-রাজেশ্বরী মূর্ত্তি দেখলে, কি আর ব্যারিষ্টার মিত্রের মস্তিষ্ক ঠিক থাকবে? তাই বলিতেছিলাম, কেন মেজদিদি বেচারাকে কাঁদাবে?"

"তামাসা! আমি মনে করেছিলাম, সত্যই বা কিছু হবে। তা পরের জন্য এত মাথাব্যথা কেন? আগে নিজের মাথা ঠিক রাখ তারপর পরের জন্য ভেব। এখন তবে যাই, মেজদিদি অনেকক্ষণ গাড়ী পাঠিয়েছেন।" বলিয়া জ্যোৎস্না প্রভাত-নলিনীর ন্যায় একটু মধুর হাসিতে প্রভাতকুমারের হৃদয় আলোড়িত করিয়া, বসন্ত বল্লরীর ন্যায় হেলিতে দুলিতে গজেন্দ্র-গমনে চলিয়া গেল।

(২)

রাত্রি সাড়ে নয় ঘটিকার সময় বারিষ্টার নগেন্দ্রনাথ মিত্রের হ্যারিসন রোডস্থ বৃহৎ ভবনের ফটকে একখানা প্রকাণ্ড জুড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। লম্ফ দিয়া প্রভাত ভূমে অবতরণ পূর্ব্বক ফটকে প্রবেশ করিলেন। রামসিং পাড়ে, সুন্দরসিং তেওয়ারী লম্বা সেলাম ঠুকিয়া দুই পাশে দাঁড়াইল, কিন্তু প্রভাত সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, দেখিলেন বাড়ীখানা বড়ই নিস্তব্ধ—উৎসবের কোনই লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয় না। প্রভাতকুমার ভাবিলেন, "নিমন্ত্রিত অভ্যাগতেরা কি এর মধ্যেই চলিয়া গেল? ব্যাপার কি? একবার দারবানদের জিজ্ঞাসা করা যাউক।" কিন্তু পর মুহূর্ত্তে ভাবিলেন 'দ্বিতলে গেলেই সমস্ত সন্দেহ ভঞ্জন হইবে, এখানে অনর্থক বিলম্বের প্রয়োজন নাই।' দ্রুতপদে দ্বিতলের সোপান আরোহণ করিতে মধ্য পথে জোৎস্না কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইলেন!

জ্যোৎস্না কহিল, "সেকি তুমি এত রাত্রিতে এলে। নিমন্ত্রিতেরা সবাই যে চলে গেছে।"

"এত শীঘ্র!"

"তা রাত কি কম হয়েছে?"

"এইত সবে সাড়ে নয়টা, মেজদিদি ত এই সময়ের কথা বলেছিলেন।"

"তোমার শোনবার ভুল; মেজদিদি কখন এমন কথা বলেন নি।"

"তা যাক্ বারিষ্টার মিত্র কোথায়? আর মেজদিদিই বা কই?"

"মেজদিদি 'পার্লারুমে' 'পিয়ানো' বাজাইতেছে। জামাই বাবুও সেখানে আছেন।"

"আমি এসেছি তাঁদের খবর দিয়ে এস।"

"আর আবার নূতন হইতেছ কেন? মেজদিদি জানে তুমি এসেছ।"

অগত্যা প্রভাতকুমার জ্যোৎস্নার নির্দিষ্ট কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মলয়া এক-খানা চেয়ারে বসিয়া দিব্য আরামে 'পিয়নো' বাজাইতেছে, আর বারিষ্টার মিত্র একখানা আরাম কেদরায় আড় হইয়া 'পিয়নো' শুনিতেছেন। মলয়ার চম্পক অঙ্গুলিগুলি কেমন উঠিয়া পড়িয়া নামিয়া পিয়নোর পরদে পরদে সুরলহরী সৃষ্ট করিতেছিল, মিত্র তাহাই মুগ্ধনেত্রে দেখিতেছিলেন।

প্রভাত, মলয়াকে এ প্রকার নিশ্চিন্ত ভাবে 'পিয়নো' বাজাইতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন! প্রভাতকে দেখিয়া ত্রস্তে চেয়ার ত্যাগ করিয়া মলয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "এই যে প্রভাত,এতক্ষণের পর, ভদ্রলোকেরা সব চলিয়া গেল এখন তুমি চোরের মত চুপি চুপি দর্শন দিলে। তোমার নামে কোন গ্রেপ্তারী ওয়ারেন্ট আছে নাকি? কেহ ধরাইয়া দিবার ভয়ে এত রাত্রিতে তাই বুঝি এসেছ? নচেৎ এত বিলম্বের অন্য কোন কারণ ত আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ভাবিয়া পাই না।"

ততক্ষণে বারিষ্টার মিত্র ও গাত্রোত্থান করিয়া প্রভাতের করকম্পন পূর্ব্বক বলিলেন, "হালো মিষ্টার ঘোষ! 'হাউ ডু ইউ ডু।' পথ ভুলে নাকি? আজ আমার 'প্রস্-পারিটীর' সীমা নাই।" তাহার পর প্রভাতের পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "কোথাও 'ইন্‌ভিটেশন' আছে নাকি?"

"বারিষ্টার মিত্র! আমার 'টাইম লেট'

হয়ে গিয়াছে তাই রহস্য করিতেছেন ; কিন্তু আপনার 'সেরিমানি' যে এত শীঘ্র শেষ হবে তাহা জানিলে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিতাম।"

"সেরিমানি ? আমার বাটীতে ! সেকি ? মলয়া ঐ ভাবের কি কথা তোমাকে বলিতেছিল বটে।"

প্রভাতকুমার কহিলেন, "কেন ? আপনি কি জানেন না, পরশু মেজদিদি আমার বাটী গিয়া 'ইনভাইট' করে এসেছেন যে, আজ আপনার বাটীতে একটা 'ইভিনিংপার্টি' আছে। আপনার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই মেজদিদি আপনার 'সাবষ্টিচিউট' হয়ে আমাকে বলে এসেছিলেন।"

ব্যারিষ্টার মিত্র বসিয়াছিলেন, লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ফারিত নয়নে প্রভাতের মুখের প্রতি দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, "আমার পা ভাঙ্গিয়াছে ! আমার পা ! আ—মা—র—পা— ! 'ওয়াণ্ডার !' আমার পা ভাঙ্গিয়াছে, অথচ আমি জানি না ! আমি আশা করি মিষ্টার ঘোষ তোমার 'ব্রেণ' ঠিক আছে।"

তাহার পর মিষ্টার মিত্র চরণদ্বয় সজোরে নাড়া দিয়া কহিলেন, "নো'—'নো,' আমার 'ফুট,' 'সোল,' 'হীল,' 'টো,' 'আঙ্কল' সবই ত ঠিক আছে। কোন ত বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না 'রিয়েলি' আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না। ব্যাপার কি মলয়া ?" এই সময়ে বাহিরে একটা অস্ফুট হাস্যধ্বনি শোনা গেল আর সে সময়ে কেহ যদি মলয়ার মুখ প্রতি দৃষ্টিপাত করিত, তবে সে বুঝিত মলয়া অনেক কষ্টে কুন্দদন্তে ফুল্লাধর চাপিয়া হাস্যসম্বরণ করিতেছে। প্রভাতকুমার দেখিলেন রহস্য মন্দ নয়। কি বলিবেন, কি করিবেন কিছু বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় নির্ব্বাকভাবে বসিয়া পড়িলেন। মলয়া কহিল, "ব্যাপার আবার কি ? তুমি সেদিন বল্লে না পা ভাঙ্গিয়াছে, যাইতে পারিব না ; প্রভাত ও জ্যোৎস্নাকে বলিয়া আইস ?"

"ব্রাভো !' 'ব্রাভো !' এর কাছে কোথা বা লাগে 'আরেবিয়েন নাইট' এখানে যদি কোন 'অথর' উপস্থিত থাকৃত, তা হলে এ'সিনারী' দেখে, একখানা 'ড্রামা' লিখ্তে পারৃত। আচ্ছা, আমার যে পা ভাঙ্গিয়াছে তার 'এভিডেন্স' কি ? তার 'উইটনেস' কই ?"

মলয়া একটু দৃঢ়তার সহিত কহিল, "তুমি এমনভাবে যে অভদ্রতা করিবে, পূর্ব্বে জানিলে, অবশ্য প্রমাণ সাক্ষী রাখিতাম। এখন বুঝেছ প্রভাত ! যেন ইনি কিছুই জানেন না, এমনি ভাবে ন্যাকা সাজিতেছেন। আসল কথা কি জান, নিমন্ত্রিত অভ্যাগতেরা যে যাহার আহারাদি করিয়া চলিয়া গিয়াছে, নিজেরও ষোড়শোপচারে উদরদেবের পূজা হইয়া গিয়াছে, এখন নিদ্রাদেবীর আরাধনার সময়, তুমি এসে ব্যাঘাত জন্মালে, কাজেই মিথ্যা কথা বই আর উপায় কি ; তাই সাফ্ জবাব পা ভাঙ্গে নাই, উৎসবও হয় নাই। তা এমন ভাবে যে বাড়ীতে বসিয়ে ভদ্রলোকের অপমান করবে, তা জান্লে আমি কখনও নিমন্ত্রণ করিতে যাইতাম না। এ অপমান ত শুধু প্রভাতের একা হয় নাই, আমারও হয়েছে।"

মলয়া এমনভাবে কথাগুলা বলিল যে, প্রভাতের সন্দেহ হইল যে, মলয়া যাহা বলি-

তেছে সবই সত্য আর বারিষ্টার মিত্র যথার্থই অপমান করিবার মতলবে ন্যাকা সাজিয়াছেন। প্রভাতের মুখ-কমল ম্লান ও বিষণ্ণ হইল। একখানা কাল মেঘ আসিয়া চাঁদকে ঢাকিয়া ফেলিলে যেমন হয়, তদ্রূপ প্রভাতের মুখ অন্ধকারে মলিন হইয়া গেল। মলয়া তাহা বেশ লক্ষ্য করিল। আর বারিষ্টার মিত্র, যিনি হাইকোর্টে দাঁড়াইয়া লম্বা লম্বা স্পীচ ঝাড়েন, তাঁহার আর একটী কথা কহিবারও সামর্থ্য রহিল না। নির্ব্বাকভাবে মলয়ার মুখ প্রতি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলেন। বারিষ্টারকে এরূপ নীরব থাকিতে দেখিয়া বিশেষতঃ মলয়ার এরূপ কথার কোন প্রকার প্রতিবাদ করিতে বারিষ্টার সাহেবকে উদ্যত না দেখিয়া, প্রভাতের সন্দেহ ধ্রুব বিশ্বাসে পরিণত হইল। প্রভাত সহসা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "গুড নাইট' মিষ্টার মিত্র!" তাহার পর মলয়াকে কহিলেন "আমার জন্য আপনাদের কোন প্রকার মনোমালিন্য হয়, এরূপ ইচ্ছা করি না। আমি চলিলাম, আপনার 'সিষ্টার' কে এর পরে পাঠিয়ে দিবেন।"

মলয়া ভাবিল লেবু বেশী চট্‌কাইলে তিক্ত হয়, অতএব আর নয়। তাহার পর যেন কতই দুঃখিত ভাবে কহিল, "তুমি যে ভাবে আমাদের বাটীতে বসিয়া অনর্থক অপমানিত হইলে, তাতে করে তোমাকে আর কি বলে বসতে অনুরোধ করি? তা জ্যোৎস্নাকে তুমিই সঙ্গে করে লইয়া যাও আজকার দিনটা আমার নিকট চিরস্মরণীয় থাক্‌বে। অদ্যকার এ চিত্রটি আমার হৃদয়-ফলকে চিরদিন অঙ্কিত থাক্‌বে। অদ্যকার তারিখ কি জান প্রভাত! 'পয়লা এপ্রেল'।"

'পয়লা এপ্রেল' বলিয়া মলয়া উভয়ের মুখ প্রতি চাহিয়া একটু মিষ্ট মধুর হাস্য করিল।

সহসা বারিষ্টার সাহেব হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিলেন, মলয়া কহিল "ও আবার কি? কত ভেল্‌কীই দেখাইতেছ।"

বারিষ্টার বলিলেন, "তা সত্য, তবে তোমার মত অতটা নয় এই যা দুঃখ। ব্রাদার-ইন-ল এতক্ষণে ব্যাপারটা কি বোধ-হয় বুঝ্‌তে পেরেছ? বিলাতে এই দিন 'এপ্রেল ফুলডে'—"

পরমুহূর্ত্তে প্রভাতের মুখের কাল মেঘখানা সরিয়া গেল। বিমল হাস্ত-জ্যোৎস্না মুখে ফুটিয়া উঠিল। বাধা দিয়া কহিলেন, "মেজ-দিদির চাতুরী এতক্ষণে বুঝ্‌তে সক্ষম হইলাম; আমাকে বোকা বানাইয়া মজা করিবার উদ্দেশ্য ছিল, তা আপনার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে।"

মিত্র সাহেব বলিলেন, "শুধু তোমাকে 'ফুল' বানান উদ্দেশ্য ছিল বল কেন? আমার উপরেই চারগুণ লক্ষ্য ছিল। চারগুণ বলি কেন? চার দুগুণে আটগুণ লক্ষ্য ছিল। ধন্য 'উওম্যান'! দু-দুটো 'ইয়ং ম্যানকে' 'ফুল' করে ছেড়ে দিলে! কিন্তু মলয়া! তোমার ও প্রকার মারাত্মক তামাসা ভাল হয় নাই। মিষ্টার ঘোষ তুমি 'ওথ' করে বল দেখি, মনে মনে একটু 'এ্যংরি উইথ' হয়েছিলে কিনা?"

প্রভাত হাসিয়া কহিলেন, "তা একটু রাগ করেছিলাম বৈ কি। বারিষ্টার বলিলেন, "মলয়া! তোমার চাতুরী এখন

জলের মত বুঝ্‌তে পাচ্ছি। বুঝ্‌লে মিষ্টার ঘোষ! অপরাপর দিন আট্টা বেজে গেলে আমার 'সাপারের জন্য' ব্যস্ত হয়ে পড়েন আজ নির্দ্দিষ্ট 'টাইম' উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তথাপি কোনই উদ্যোগ না দেখিয়া, আমি নিজেই সে বিষয়ে উল্লেখ করিলাম, কিন্তু তথাপি কোন উদ্যোগের লক্ষণই দেখিলাম না। উপরন্তু জ্যোৎস্না পিয়নো শুনিতে চাহিতেছে বলিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, আমিও সানন্দ চিত্তে সম্মত হইলাম। এখন বুঝিতেছি আমার অজ্ঞাতে তুমি নিমন্ত্রিত হইয়াছ। অগ্রে গৃহস্বামীর আহার করাটা সভ্যতা বিরুদ্ধ অথচ বলিলেও 'মিষ্টি' পণ্ড হইয়া যায়, কাজেই 'টাইম' কাটাইবার জন্য একটা কিছু চাই। তাই পিয়ানোর অবতারণা। কেমন ঠিক হইয়াছে কি না?" বলিয়া মলয়ার মুখ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যারিষ্টার মিত্র হাসিতে লাগিলেন।

মলয়া কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া মৃদু মধুর হাসিতে হাসিতে কহিল, "তোমার বক্তৃতা প্রভাত শুনিতে চায় না। এখন খাবারগুলি যে টেবিলের উপর অনাথ ভাবে পড়ে কেঁদে কেঁদে জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে, তাদের সনাথ করে উদর নামক ধ্বংস-পুরে পাঠিয়ে সদ্গতি করবে চল।"

"আমার সে বিষয়ে আপত্তি নাই। আশা করি মিষ্টার ঘোষ তোমারও নাই।"

উভয়ের ভোজন গৃহে এসময়ে বড় একটা আলাপ হইল না, কিন্তু কাঁটা, চামচ, সানকীর সহিত যে প্রকার আলাপ হইতে এগিল, সে ভাষা সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ আনভিজ্ঞ কাজেই এখানে তাহা লিপিবদ্ধ হইল না।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

ভাবের অভিব্যক্তি।

গল্পটি বেশ জমিয়া আসিতেছিল। নাট্য-জগতের ছোট বড় সকল অভিনেতা অভিনেত্রীই একে একে এই গল্পের মধ্যে স্থান পাইতেছিলেন। কে কখন কি ভাবে যশের উচ্চ শিখরে আরোহণের সুযোগ লাভ করিয়াছেন উপস্থিত তাহারই বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও উদাহরণ চলিতেছিল।

রমেশ বলিল "ভাবের অভিব্যক্তিতে অচলেন্দু কি ক'রে এতখানি দখল নিয়ে আজ দেশের মধ্যে সর্ব্বোত্তম অভিনেতার নাম নিতে পেরেচে সে সম্বন্ধে তোমরা বোধ হয় বিশেষ কিছু জান না। অচলেন্দু আর আমি তখন আমরা দুজনেই নাট্যকলা শেখ্‌বার জন্যে অসীম অধ্যবসায়ে কাজে লেগেছিলাম। আমাদের তখন কেউ জান্‌তও না পুঁছ্‌তও না। নগণ্য চুনোপুঁটীর দলেই আমরা পড়েছিলাম। আমরা দুজনে এক সঙ্গে একটা মেসে থাক্‌তাম। সে যে কালে নীচে থেকে খুব উঁচুতে উঠ্‌তে পারে তার কিছু লক্ষণ বোধ হয় গোড়া থেকেই তাঁ'তে পাওয়া যায়। প্রথম প্রথম যখন অচলেন্দুকে খুব ছোট ছোট পার্ট দেওয়া

হোত তার মধ্যেও একটু বিশেষত্ব সে দেখাতে পারত। সে পরিশ্রমীও খুব ছিল। যখন তাকে কেউ চিনত না তখনও সে যেমন ছিল, এখন যে মাসে সে হাজার টাকা উপায় কচ্চে, এখনও তার স্বভাব ঠিক তেমনিই আছে। "ওরিয়েণ্টাল" থিয়েটারের অবস্থা তখন খুব খারাপ যাচ্ছিল। দর্শক হোতই না। সবাই ভাবছিল থিয়েটারটি এইবার উঠে যাবে, কিন্তু সেই সময় হঠাৎ অচলেন্দুর একদিনের একটি অভিনয়ে থিয়েটারের, আর তা'র নিজেরও ভাগ্য ফিরে গেল। নাটকের বিষয়টি অতি সামান্য! পুলিশ স্ত্রী হত্যাকারী সন্দেহে হতা নারীর স্বামীকে গ্রেপ্তার করে, বেচারা স্বামীটি কিন্তু সম্পূর্ণই নিরপরাধ।

অচলেন্দু সে নাটকখানিতে স্বামীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। নিরপরাধ স্বামীর, গ্রেপ্তারের পর যে মুখের ভাব সে প্রকাশ করেছিল সেই আশ্চর্য্য, ভয়, বিস্ময় ও দুঃখ মিশ্রিত যে অদ্ভুত ভাব সত্যের চেয়েও সজীব ভাবে, সে দর্শকদের চোখের উপর প্রকাশ কর্ত্তে পেরেছিল সেইটিতেই তা'র ভাগ্য ফিরে গেছ্ল। কিন্তু আমি জানি এই ভাব সংগ্রহে তা'কে বড় অল্প চেষ্টা কর্ত্তে হয়নি। সেই গল্পই আজ বলব।

ভূমিকা গ্রহণ ক'রে পর্য্যন্ত বেচারীর আহার-নিদ্রা বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছিল। রাত্রে প্রায়ই দেখতেম সে ঘুরে বেড়াচ্চে। হয় ত সারারাতই সে এমনি ঘুরে বেড়াত। তিনচার দিনে তার চেহারা যে রকম খারাপ হয়ে গেছ্ল তাকে দেখলে ভয় হোত। একদিন রিহার্সাল থেকে ফিরে সে হতাশ ভাবে বল্লে 'রমেশ আমার আশা ভরসা সবই শেষ হয়ে গেল, আমার দ্বারা এ ভূমিকার অভিনয় হ'বে না।' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লাম, 'ব্যাপারটা কি বল দেখি দিনরাত খাটচ, এত ভাবচ, হ'বে নাই বা কেন?' সে জবাব দিলে, 'খাটলেই যদি হোত তাহলে আর ভাবনা ছিল না। যখন ছোট খাট পালাগুলো কর্ত্তাম কত রকম ভাব আপনিই মুখে আসত কিন্তু এ হতভাগা পালাটার নায়ক ক'রে আমায় পাগল করে দিয়েচে।' কথার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘরের বড় আর্শিখানার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের ভূমিকা আবৃত্তি কর্ত্তে কর্ত্তে বল্লে, 'দেখ দেখি এ মুখ কি খুনী অপরাধে অভিযুক্ত কোন নিরপরাধীর মুখের মত দেখাচ্চে? ও মুখ দেখে লোকে গায়ে ধুলো দেবে না ছিঃ ছিঃ করবে না কি?'

আমার কিন্তু তার অভিনয় বেশ ভালই লাগছিল। তার পাগলামীতে বাধা দেবার জন্যে বল্লাম, 'কোথায় দোষ আছে? বেশই ত হচ্চে।' ক্ষোভে দুঃখে তার গলা পর্য্যন্ত বুজে আসছিল; সে দুঃখের চাপাহাসি হেসে জবাব দিলে, 'কোথায় ভুল হচ্চে? সবই ত ভুল! চিড়ীয়াখানার পোষা বানরকে একটা কলা খেতে দিয়ে কেড়ে নিলে তার যেরকম মুখের ভাব হয় এ যে তেমনও হচ্চে না। ম্যানেজার যদি আমায় অন্য ভূমিকা দিত তা'হলে আমি বেঁচে যেতুম; এখন আমার কান্না পাচ্চে।' আর্শির সামনে আরও খানিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখের ভাবের পরিবর্ত্তন-চেষ্টার বিফলকাম হয়ে সে হতাশভাবে তক্তপোষের উপর ব'সে পড়ল। আমি

বল্লাম, 'এই মাত্র রিহার্শাল থেকে ফিরচি। এখন খানিক আগে জিরও তারপর যা হয় কোরো।' সে বল্লে,—'জিরব কি ক'রে? পোড়া চোখে কি ঘুম আছে!' আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত বল্লাম,—'সাধ্য থাক্‌লে আমি তোমায় সাহায্য করতাম, কিন্তু কি করব ভাই, তোমার মত আমার ত প্রতিভা নেই, শক্তিও নেই।' আমিও একবার আর্শির কাছে দাঁড়িয়ে মুখে দুঃখের ভাব আন্‌বার চেষ্টা কল্লাম। অচলেন্দু দুঃখের হাসি হেসে বল্লে 'থাক্, ও আর কেন?' যে ভাব তুমি দেখাচ্চ আর যা আমি দেখালেম, দর্শকদের কাছে যখন এই ভাব দেখাব তখন তারা হয় হেসে লুটো পুটি খাবে নয় মনে করবে আমাদের হৃদয়ের গোল ঘটেচে। কাজ নেই ভাই ক্ষমা দাও।' আমি তার কথা শুনে হেসে উঠ্‌তে সেও ক্ষীণভাবে তাতে যোগদান কল্লে। তারপর দুজনেই চুপ করে রইলাম। ঘরের ভিতরে বাতির আলোটা বাতাসে কাঁপ্‌ছিল, আর তা'র সঙ্গে আমাদের বিকৃত ছায়া দুটোও দেয়ালের গায়ে নাচ্‌ছিল। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে আমার ভাবনা হচ্ছিল, কি উপায় এর করা যেতে পারে। হঠাৎ একটা কথা আমার মনে হওয়ায় আমি লাফিয়ে উঠ্‌লাম! তাড়াতাড়ি বন্ধুর পিঠে একটা থাবড়া মেরে বলে উঠ্‌লাম 'হয়েচে ভাই হয়েচে। একটা মতলব বেরিয়েচে!' সে আশ্চার্য্য হ'য়ে বল্লে, 'কি হয়েচে?' আমি বল্লাম 'অব্যর্থ উপায়—যাতে তোমার ঠিক্ কাজ হবে, যেমন মুখের ভাব তুমি চাইচ তারই আদর্শ মিলে যাবে।'

সে অবিশ্বাসের হাসি হেসে বল্লে "যা বলবার বলে ফেল, কিন্তু অল্প কথায়, বেশী সময় নিওনা। আমি মনে মনে হাস্‌লাম, আমার মাথায় যে খেয়াল চেপেছিল তার সার্থকতার সম্বন্ধে আমার মনে কোন দ্বিধা আসেনি। উত্তেজনা ও আনন্দাতিশয্যে আমার গলা যেন ভেঙে আস্‌ছিল। যথাসাধ্য সংযত ভাবেই আমি বল্লাম,—'গঙ্গাধরের কথা তোমায় যা'বলে ছিলাম মনে আছে ত? সেদিনকার সেই লোকটা—'কোন লোকটা? যা'কে সেদিন পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে খাইয়ে দাইয়ে কাপড় চোপড় দিয়ে সুস্থকরে ছেড়ে দিলে, তা'র কথা বলচ?' 'হাঁ, সেই—তাকে ছেড়ে ঠিক্ দিইনি, কাকার দোকানে তাকে চাকরী একটা জুটিয়ে দিয়েচি। খিদিরপুরে একটা বস্তিতে একখানা খোলার ঘর ভাড়া নিয়ে সে থাকে—তার ঠিকানাও আমি জানি। লোকটা ভারী অল্পে উত্তেজিত হয়ে উঠে,—অত্যন্ত নার্ভাস। চল, আমরা দুজনে পুলিশ সেজে আজ রাত্রিরেই তার বাসায় গিয়ে হাজির হই।'

'আর আমার ভূমিকার নায়কের স্থলাভিষিক্ত ক'রে তাকে খুনী বলে গ্রেপ্তার করি,—কেমন, এইত বল্‌চ?' সে আনন্দে চিৎকার ক'রে উঠ্‌ল 'ব্র্যাভো! চমৎকার প্ল্যান্ বার করেচ। যেমন সহজ, তেমনি সুন্দর! একটুও দেরী নয়, চল! এখনি মতলবটা টাট্‌কা টাট্‌কা খাটাবার চেষ্টা দেখা যাক্।' তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ঘড়ি বার করে সে বল্লে,—'দশটা বাজ্‌ল। একখানা ভাল গাড়ী নিলে আধঘণ্টার ভেতর আমরা গিয়ে পৌছুব?' আমি বল্লাম,—'এত তাড়াতাড়ি কি? কালই হবে এখন?' সে বল্লে,—

'না ভাই—লোহা লাল থাক্‌তে থাক্‌তেই তাকে পেটা ভাল। কি জানি অদৃষ্ট বৈগুণ্যে সে যদি কালই বাসা বদ্‌লায়। তা ছাড়া তোমার এই মতলবের ফল না দেখে আমার যে চোখে একফোঁটা ঘুমও আস্‌বেনা ছাই। আচ্ছা মত্‌লব বার করেচ কিন্তু! নাটকীয় সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা, সত্যের অপূর্ব্ব উদাহরণ! তার বাড়ীতে গিয়ে মাঝ রাত্রে ঢোকা, দরজায় ধাক্কা দেওয়া, তারপর ওয়ারেণ্ট বারক'রে দেখান। ওহো, আগে দেখা যাক ওয়ারেণ্টের মত ধরণের কাগজ কিছু ডেস্কে পাওয়া যায় কি না। ওয়ারেণ্ট দেখেই লোকটার হতাশ ভাব, তার সাশ্চর্য্য দৃষ্টি, তার মুখে ভয়-ভাবনা-বেদনার মিশ্রিত ভাব, আমি যেন চোখের উপর ম্যাক্‌বেথের ভূতের দৃশ্যের মত একের পর এক স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চি! আর এক মিনিটও দেরী করা নয় রমেশ, চল একখানা গাড়ীর চেষ্টা দেখা যাক। এই যে এই নীল কাগজটাকে ওয়ারেণ্ট বলে চালান যাবে।' আমি একটু ভেবে বল্লাম, 'কাজটা কিন্তু অত্যন্ত গর্হিত। আর বে-আইনী হ'বে। একটা নির্দ্দোষী মানুষকে খুনী বলে ওয়ারেণ্টের ভয় দেখাতে যাওয়া নেহাৎ তামাসার ব্যাপারও ত নয়! অবশ্য সে বেচারী এখন দুঃখে পড়েচে এই যা' ভরসা। যাতে বক্‌সিস্ টক্‌সিক দিয়ে পরে তা'কে শান্ত করতে পারা যেতে পারে। তার একটা উপায়কর্‌তে হবে।' অচলেন্দু বল্লে, 'নিশ্চয়ই,—তা' কর্‌ব বই কি। আমি গরীব মানুষ, বেশী ত পর্‌ব না, তবে আজ রাত্রেই তা'কে দশটি টাকা দেব। আর থিয়েটারের ৪খানা টিকিট দেব। সে যখন সব শুন্‌বে, নাট্যকলার উৎকর্ষের জন্যে আমাদের এ চেষ্টায় খুব বেশী রাগ কর্‌তে পারবেও না।' আমি বল্লাম,—'বেশ্, কিন্তু আর দেরী করা নয়, তাহলে হয়ত আমি একাজে সাহায্য কর্ত্তে পার্‌ব না। কারণ মতলবটা বার ক'রে এখন মনে মনে আমার লজ্জাই হচ্চে।' সে আমার কথায় কানও দিলে না। তাড়াতাড়ি বাক্স খুলে একটা দাড়ী গোঁপ বার করে মুখে আঁট্‌তে লেগে গেল। আমায় বল্লে,—'রমেশ শীগ্‌গির হাত চালিয়ে চেহারা ফিরিয়ে নাও। ইউনিফর্মের দরকার নেই, এসব কাজে ডিটেক্‌টিভেরা সাদা কাপড়েই কাজ করে থাকে;—তাছাড়া এই রাত্রে বস্তিতে গিয়ে পুলিশের পোষাকে হৈ চৈ কর্‌তে আমার সাহসও হয় না। বাঃ, দাড়ী প'রেই তোমায় খাসা গম্ভীর গম্ভীর ভারিক্কি চেহারা দেখাচ্চে। আর কিছুর দরকারও নেই, চল।"

তা'র কথা বা কাজে বাধা দেবার বা অসম্মতি প্রকাশের সময় বা ইচ্ছা কিছুই যেন তখন আমার ছিল না। তাড়াতাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে পড়্‌লাম। গাড়ীতে উঠে কে কি কর্‌ব ঠিক্‌করে নিলাম। আমিই ওয়ারেণ্ট ধরান, কথা বার্ত্তা কওয়া সব কর্‌ব আর সে পাশে দাঁড়িয়ে তার ঈপ্সিত ভাব পর্য্যবেক্ষণ কর্‌বে। কথা শেষ হ'তে হ'তেই আমরা খিদিরপুরে এসে পৌঁছুলাম। নির্দ্দিষ্ট স্থানের কাছাকাছি এসে গাড়ী ছেড়ে দিলাম! গরীব পল্লী। তখনও কেউ কেউ বাড়ী ফির্‌চে। খবর নিয়ে জানলাম সে এই অল্পক্ষণ মাত্র বাসায় ফিরেচে। জীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে উঠে "মাট্‌"-কোঠা"র একখানি জীর্ণ ঘরের

দরজার কাছে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম। একখানা বাড়ীতে অনেকগুলি ভাড়াটে, অধিকাংশ ঘরই বন্ধ। সবাই বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েচে। সাড়াশব্দ বেশী না করে আমরা সরাসর তার ঘরের কাছেই এসে দাঁড়ালাম। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমার একবার বিবেকবুদ্ধি জেগে উঠেছিল। এই ঘুমন্ত রাতে, সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনীর পর বেচারা এইবার বিশ্রামের অবসর পেয়েচে। হয়ত ক্লান্তিতে চোখের পাতা এতক্ষণ বুজে গিয়ে থাক্‌বে। হয় ত বা চেষ্টা করে খাবার জোগাড়ও সে করে নি, না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েচে। এমন সময় এমন করে অতর্কিত আঘাত! চুপি চুপি অচলেন্দুকে বল্লাম,—'চল ফিরে যাই—এখনও সময় আছে—কাজ নেই ভাই—'অন্ধকারে বজ্রমুষ্টিতে সে আমার ডান হাতখানা সজোরে চেপে ধর্‌লে, ক্রোধ-বিকৃত-স্বরে উত্তর দিলে,—'অসম্ভব! এখন তুমি ফির্‌তে পার—আমার ফেরবার আর উপায় নেই। ভেবে দেখ মিনিট দুইয়ের অপেক্ষা, আমিও তার মুখের ভাবটি মনে এঁকে নেব সেও দশটাকার নোটখানি বাক্‌সে তুল্‌বে। বাধা দিওনা এগোও।"

যে বৈদ্যুতিক শক্তির বলে ভারতবর্ষ-ব্যাপী দর্শককে এখনও সে আকর্ষণ কর্‌তে পাচ্চে, সে শক্তির অঙ্কুর তখনও তার ভেতরে উপ্ত হয়েই ছিল। তা'র মত বদল কর্‌তে আমার শক্তি হোল না। আমি তার ইচ্ছার হাতে যন্ত্রের পুতুলের মতই নিজেকে চালিয়ে দিলাম। দোর বন্ধই ছিল। আমরা একবার জোরে ধাক্কা দিতে ভিতর থেকে চাপা স্বরে আওয়াজ এল, 'কে? এতরাত্রে কে তোমরা—কি চাও?' আমি গম্ভীর স্বরে বল্লেম,—'আইনের দোহাই দরজা খোল।' আস্তে আস্তে দরজার হুড়ুক খোলা শব্দ পেলাম। ঘরে আলো ছিল। সে তখনও জামা কাপড় খোলেনি, দোর খুলে একটু পাশে সরে দাঁড়াল। আমরা ঘরে ঢুক্‌লাম সে অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। আমি সে সময়েও অচলেন্দুর মুখের দিকে না চেয়ে পার্‌লাম না। শিকারী বিড়াল যেমন করে অসতর্ক ইঁদুরের দিকে চেয়ে থেকে ঠিক তেম্‌নি করে সে তখন তার শিকারের পানে চেয়ে ছিল। তা'র মুখের প্রত্যেক আকুঞ্চন-বিকুঞ্চনটিও যেন তার চোক্ থেকে এড়িয়ে না যায় এম্‌নি একটি সতর্ক সাবধানতার ভাব যেন তার মুখে ফুটে উঠেছিল।

ওয়ারেন্ট খানা পকেট থেকে বার করে তার সামনে ধরে বল্লাম 'আমি পুলিশের কর্ম্মচারী। তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে একটি স্ত্রীলোককে খুন করার অপরাধে তোমায় আমি রাজার হুকুমে গ্রেপ্তার কল্লাম।' মুহূর্ত্ত মধ্যে তা'র মুখের অদ্ভুত ভাব পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। একবার দরজার দিকে,-একবার জান্‌লার দিকে তার চোখ্ ঘুরে এল। পলায়নেচ্ছু পিঞ্জরাবদ্ধ জন্তুর মত চোখদুটো যেন জলে উঠ্‌ল। চিত্রকর কোনও দৃশ্য আঁক্‌বার পূর্ব্বে যেমন করে তার আদর্শের দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে চেয়ে থাকে অচলেন্দু তেমনি করেই তার সাম্‌নের অভিযুক্ত আসামীর পানে চেয়ে দেখ্‌ছিল। তারপর আচম্বিতে যে ঘটনা ঘট্‌ল তাতে বিস্ময়ে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠ্‌ল। আজ পর্য্যন্ত তা'র সেই হতাশের সুর আমার কানে বাজ্‌চে,—এখনও যেন আমি সে স্বর শুন্‌তে পাচ্ছি। সে বলে

উঠ্‌ল "সব শেষ,—সব শেষ,—আমার আশা ভরসা আর কিছু নেই। যা' তোমরা বলচ, আমি সবই স্বীকার কচ্চি। আমাকে কি ক'রে যে তোমরা খুঁজে বার কর্‌লে তা আমি জানিনা—জান্‌তে চাইও না।' সে তার মাথার কৃত্রিম চুল আর দাড়ীগুলি এক টানে খুলে ফেলে দিলে। আমরা সাশ্চর্য্যে দেখলাম সে মূর্ত্তি খুব অপরিচিত নয়—তার ফটো থানায় থানায় অনেক জায়গায়ই এঁটে দেওয়া হয়ে ছিল। তিন হপ্তা আগে সে তা'র স্ত্রীকে খুন করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছ্‌ল। গদাধর তার আসল নাম নয়,—তার নাম হরকান্ত মাইতি।

হরকান্ত তার নিজের কাহিনী বলেছিল। সে বলেছিল,—'আপনারা জেনেছেন আমি খুনী, আমার স্ত্রীকে আমি খুন করেচি। কিন্তু কেন যে করেচি, মানুষ হয়ে মানুষের বুকে,—একদিন যা'কে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে ভাল বেসে ছিলাম,—তা'র বুকে কেমন ক'রে যে ছুরী মেরেছিলাম, কতবড় আঘাতে, কতখানি যন্ত্রণায় যে মানুষ দানব হয় তা আমি জানাতে চাইচি না। তবে তাকে নিজের হাতে মেরে—আমি যে অনুতপ্ত হই নি এ কথা এখনও বল্‌তে পারি। এখানে আর এখানকার উপরকার যে আদালতেই আমার বিচার হোক আমি হাসিমুখেই সে দণ্ড নেব। তবু নিজের অপরাধকে অপরাধ বলে স্বীকার করব না। আমি তৈরী হয়েই আছি—মর্‌তে আমার ভয় নেই—ফাঁসীতে কেবল ভয় করেছিলাম। যাক্ মানুষ মারাপ যে পাপ তার শাস্তি হয়েই যাক্—চলুন কোথায় যেতে হবে চলুন।' সে অগ্রসর হয়—আমি অচলেন্দুর পানে চেয়ে দেখ্‌লেম। এতবড় ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারেও সে সমান অবিচলিত ভাবে তার আদর্শ সংগ্রহ করে নিচ্ছিল। একটি কথাও সে বলেনি। এতটুকু আশ্চর্য্যভাবও দেখায় নি। শেষ পর্য্যন্ত সে যেন কেবল চোক্ দিয়েই ঘটনাটিকে গ্রাস কচ্ছিল। নাট্যকলাই ছিল তার প্রাণ—মনুষ্যত্ব তার নীচে। প্রতারিত স্বামীর নিজমুখের স্বীকারোক্তি তৎকালীন মনোভাবের প্রকাশ,—শুধু "বিরজা নাটকে নয় "ও থেলো" নাট্যাভিনয়েও তার যশের সিংহদ্বার মুক্ত করে দিয়েছিল। সেই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বীজ কিন্তু তা থেকেই আজ প্রকাণ্ড মহীরুহের উৎপত্তি করেচে।

"ওরিএণ্টাল" থিয়েটারে অচলেন্দু নায়ক "বিকাশে'র পাট নিয়ে প্রথম দিনেই যে আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছিল, তাতে দর্শকদের শুধু মুগ্ধ করা নয়—একেবারে কিনেই ফেলেছিল। সেই এক রাত্রের অভিনয়ে টলটলায়মান রঙ্গভূমি আর তার গরীব অভিনেতা দু-এরই ভাগ্য পরিবর্ত্তন হয়ে গেছ্‌ল। উপর্য্যপরি প্রতি শনিবার ঐ একই নাটকের অভিনয়, আর একই প্রকার লোক সমাগম চল্‌ছিল। থিয়েটারে লোকের স্থান সঙ্কুলন হয়না। পুলিশ দিয়ে ভিড় কমাতে হয়, বেলা দু'টো না বাজ্‌তেই টিকিট ঘরের সাম্‌নে অভিনয় দর্শনেচ্ছু লোকের ভীড় জম্‌তে থাকে। সেই একটি মাত্র দৃশ্যে "পুলিশ কর্ত্তৃক স্ত্রীহত্যাকারী বিকাশের গ্রেপ্তার দৃশ্যে" অভিনয়ের সকল ত্রুটিই সেরে নিয়েছিল। অভিনেতার আশ্চর্য্য স্বাভাবিক ভাবপ্রকাশের দক্ষতা মুখে মুখে সংবাদপত্রে দেশব্যাপী জয়গানে ভরে উঠেছিল।

যে অভাগা নিজের দুর্ভাগ্য দিয়ে অচলেন্দুর ভাগ্য ফিরিয়ে দিলে, বিচারক তাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের হুকুম দিয়াছিলেন। সে তার দুর্ব্বহ জীবন বইতে পারছিল না বলে ফাঁসিকেই কিন্তু কামনা করেছিল।

গল্প শেষ করিয়া ধূমমলিন রাজপথের দিকে তাকাইয়া একটা সহানুভূতির নিঃশ্বাস ফেলিয়া রমেশ কহিল, আজ এই খানেই উপসংহার করা যাক্। ভাবের অভিব্যক্তির বিষয়ে আরো কিছু আমার বলার ছিল! কিন্তু আজ আর নয়—বারান্তরে।"

শ্রীইন্দিরা দেবী।

বসন্ত-প্রাতে।

বন্ধু বসন্তে আজ এত কোকিল ডাকে
বউল-ভরা আম্র-গাছের শাখে,
বাহিরে আজ এত ফুলের মেলা,
হরিৎ শ্যাম রঙের হোরি-খেলা!
তরু-মর্ম্মর দক্ষিণ বাতাসে
এমন মধুর গন্ধ ভেসে আসে!—
তারি মাঝে আমিই রইবো দীন
রইবো এমন পুষ্প-গীতি-হীন?
বসন্তে আজ সরস নিখিল ধরা,
রূপে রসে বর্ণে গন্ধে ভরা;
কুঞ্জতরু মুঞ্জরিত আজি;
শ্যাম-বসনে বাহির হ'ল সাজি
নিশীথ-রাতে কি যে শোভা জাগে,
রূপের ঢেউ হৃদয়-তটে লাগে
বিশ্বে যখন কেহই নহে দীন,
আমি র'ব পুষ্প-গীতি-হীন?
মোরে তুমি নবীন করি লহ,
মোর সকল বোঝা আপ্‌নি তুমি বহ;
দুঃখ-ব্যথা হরণ করি মোর—
আজকে গাঁথ নব-প্রেমের ডোর;—
বসন্তেরি বন্যামাঝে আজ
মোরেও তুমি পরাও রাজার সাজ;
ডুবিয়ে হোথা নূতন মোরে কর
প্রেমে গানে গন্ধে হৃদয় ভর॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

কলিকাতার স্বাস্থ্য ও শিশুমঙ্গল-প্রদর্শনী।

সম্প্রতি কলিকাতা টাউনহলে শিশুমঙ্গল-প্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। লর্ড রোণাল্ডশে এই প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন। এই প্রদর্শনী উদ্‌ঘাটনকালে লর্ড রোণাল্ডশে বাহাদুর তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন;—"বঙ্গের জনসাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ বলিয়াই এদেশ এরূপ স্বাস্থ্যহীন ও এত অধিক সংখ্যক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।"

গত বৎসর বঙ্গে ১৬ লক্ষ ৪১ হাজার ১ শত ১১ জন লোকের মৃত্যু ঘটিয়াছে। যে সকল রোগে এই মৃত্যু ঘটিয়াছে, সে সকল রোগের অধিকাংশই নিবার্য্য। এই মৃত্যু সংখ্যার ভিতর ৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৭ শত ৫৫টী দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক, ২ লক্ষ ৭৮ হাজার ৩ শত ৭০টী এক বৎসরের ন্যূন বয়স্ক শিশু। কলিকাতা সহরে গড়ে প্রত্যহ ১৬টী শিশু মারা গিয়াছে; আর এই যে ১৬টী শিশুর মৃত্যু,—ইহার ভিতর ১৪টী শিশু,—তাহাদের পিতামাতা প্রভৃতি পরিপালকগণের অজ্ঞানতা নিবন্ধনই মারা পড়িয়াছে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গবর্ণর বাহাদুর এই শিশু-মৃত্যু রোধের প্রতিকার পরায়ণ হইয়াছেন। এই শিশু-মঙ্গল-প্রদর্শনীর এক উদ্দেশ্যও তাহাই। এই প্রসঙ্গে আগামী বৎসরের বজেটে ৩০ হাজার টাকা রাখা হইয়াছে।

এই প্রদর্শনীতে বক্তৃতা ও চিত্রাদির দ্বারা নানা উপায়ে রোগ-নিবারণ ও শিশুপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দানকরা হইয়াছে।

এফ, আর, এস—সার জগদীশচন্দ্র বসু লণ্ডনের রয়াল সোসাইটীর ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। মৌলিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া যাঁহারা প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা ভিন্ন আর কেহ রয়াল সোসাইটীর সভ্য হইতে পারে না।

পাটনায় মেডিকেল কলেজ—পাটনা সহরে একটী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বাহাদুর বিহার উড়িষ্যার ছোটলাট সার এডওয়ার্ড গেটের হস্তে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ছোটলাট বাহাদুরও মহারাজকে ধন্যবাদ দিয়া ইহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন।

দেশীয় চিফ জষ্টিস—কলিকাতা হাইকোর্টের চিফ জষ্টিস সার ল্যান্সলট স্যাণ্ডারসনের স্থানে জজ সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অস্থায়ী চিফ জষ্টিস নিযুক্ত হইয়াছেন।

২১১, নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত
শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক, ৩৯ নং এণ্টনীবাগান লেন হইতেপ্রকাশিত।